বাংলার মেয়ে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কল্পলোক
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০

প্রকাশক :
শ্রীহেমেন্দ্র কুমার শীল
পর্ণ কুটীর
৬, কামারপাড়া লেন
কলিকাতা-৩৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীগণেশ বসু

পরিবেশক :
কল্পলোক
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

ঃ বাংলার মেয়ে ঃ

বহুকাল ধরিয়া জমিদারী সেরেস্তায় 'নায়েবী' করিয়া বিষয়-বুদ্ধিতে রাসবিহারীর মাথাটাও যেমন পাকিয়া উঠিয়াছিল, চুরি-চামারি করিয়া নিজের বিষয়-সম্পত্তিও তেমনি তিনি বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, এই অঞ্চলে তাঁহার মত অমানুষিক এবং নৃশংস অত্যাচার করিয়া প্রজাদের জব্দ করিতে আর কোন নায়েব কোন কালে পারেন নাই। এই পরম লোভনীয় সদ্‌গুণটি নাকি বাংলার অধিকাংশ জমিদারের কাম্যবস্তু। অমরপুরের জমি-দারেরই বা তাহা না হইবে কেন? কাজেকাজেই রাসবিহারীর এই এত বড় 'সার্টিফিকেট্, নিতান্ত ব্যর্থ হইল না। চাক্‌রী তাঁহার চিরস্থায়ী হইল বলিয়া সদর কাছারি হইতে একটি সনন্দ লাভ করিয়া তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন এবং প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন।

যে গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান, যে মাটির জল, হাওয়া এবং শস্য, বাল্যা-বধি তাঁহাকে মায়ের মত মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, সেই গ্রামেরই বিধাতা-পুরুষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতাপ তাঁহার প্রতিদিন যেন বাড়িয়া চলিতে লাগিল। বয়স তাঁহার চল্লিশের কোঠা পার হইয়াছে, গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণ, চুল পাকে নাই, দাঁতও ভাঙ্গে নাই, চোখ দুইটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ। প্রাতে এবং অপরাহ্ণে চায়ের সহিত এক ডেলা আফিং খাইয়া তামাক টানিতে টানিতে নেশায় যখন তিনি মশ্‌গুল হইয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিত।

একদা ফাল্গুনের এক মধ্যাহ্নবেলায় সদর হইতে রাসবিহারীর উপর এক হুকুম আসিল, জমিদারের সব চেয়ে বড় মৌজা গোবর-ডাঙ্গায় তাঁহাকে একবার যাইতে হইবে। জমিদারের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ, বহু অর্থব্যয় করিতে হইবে, কাজেই এ সময় একবার সেখানকার প্রজাদের নিকট হইতে কিছু কিছু 'মাড়োচা' আদায় না করিলে বুঝি-বা এই সংকটের সময় জমিদারের মান-সম্ভ্রম কিছুই থাকে না, এবং এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম একমাত্র রাসবিহারী ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয় বলিয়া, জমিদার স্বয়ং নিজ-হস্তে তাঁহাকে এই কথা কয়টি অমরপুর হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এই সব কাজে রাসবিহারী চিরদিন প্রস্তুত হইয়াই থাকিতেন। সেই দিন অপরাহ্ণে এক বাটি চা এবং আফিং সেবন করিয়া গোবর ডাঙ্গা যাইবার জন্য তিনি একখানি গরুর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

পরদিন গোবরডাঙ্গার দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বেশ একটা সোর-গোল পড়িয়া গেল। একে ত উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর ধরিয়া অজন্মায় ফসল তাহারা একপ্রকার পায় নাই বলিলেই হয়, তাহার উপর ম্যালেরিয়ায় এতবড় গ্রামখানা একেবারে উজাড় হইতে বসিয়াছে,—এহেন কষ্টের সময়ে রাসবিহারীর আগমন, তাহাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিল, এবং এই জমিদার-কন্যার বিবাহের ছুতা লইয়া তাহাদের উপর উৎপীড়ন যে কিরূপ উৎকট হইয়া উঠিবে সকলেই তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

দু' একজন দুঃসাহসী দরিদ্র প্রজা সকাল হইতে জমিদারের কাছারি বাটীতে আসিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী রাসবিহারীর কাছে নিবেদন করিয়া গেল, কিন্তু রাসবিহারী গুড়গুড়ির নল টানিতে টানিতে প্রত্যেককেই তাঁহার চিরাভ্যস্ত স্পষ্ট এবং রূঢ় কথা শুনাইয়া দিয়া তাহাদের অন্তর ছেদ করিয়া দিলেন।

একজন বৃদ্ধ প্রজা আসিয়া বলিল,—এবারকার মত মাপ করুন হুজুর, আমাদের দুরবস্থা যদি একবার সচক্ষে দেখতেন, তা'হলে আপনি কখনও এরকম কথা বলতে পারতেন না।

মুখ হইতে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া রাসবিহারী তাঁহার তীক্ষ্ণ হিংস্র চক্ষু দুইটা বক্তার মুখের পানে তুলিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—যার যা খুশী তাই বল্‌বে আর আমরা নির্ব্বিচারে তাই শুনে যাব কেমন? অরাজক পুরী পেয়েছ নয়? এখনও সব ভালয় ভালয় বল্‌ছি বাপু, মানে মানে বাড়ী গিয়ে মাড়োচার টাকা এনে দাও নইলে,—বলিয়া দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি ডাকিলেন—কোটাল!

জমিদারের পিয়াদা বাহিরে বসিয়াছিল, ডাক শুনিয়া সন্ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল,—হুজুর!

—এই তোমায় বলে রাখছি আমি, এবার থেকে হাতে টাকা-কড়ি না নিয়ে যদি কেউ আমায় বিরক্ত করতে আসে, তা'হলে, কাছারির দরজা থেকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে তাকে দূর করে দিও। ভালর কাল নয় কিনা, যত নরম হয়ে থাকি বেটারা ততই আমায় পাকা কলা পায়।—আর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হস্ত-ধৃত নলে তিনি কসিয়া টান দিতে সুরু করিলেন।

গ্রামের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল যে, কাকুতি মিনতিতে সেখানে কোন ফল ফলিবে না। বরঞ্চ, চোখের জল ফেলিলে দু'দশ টাকা অর্থ দণ্ডও হইয়া যাইতে পারে,—সুতরাং যেমন করেই হউক, জমিদার কন্যার বিবাহে যৌতুক-স্বরূপ যাহার যাহা সাধ্য দিতেই হইবে।

পরদিন হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা আসিয়া কাছারির তহবিলে জমা হইতে লাগিল। কেহ বা রোগীর ঔষধ-পথ্য বন্ধ করিয়া টাকা দিয়া গেল,—একবেলা উপবাস করিয়া কাটাইবে মনস্থ

করিয়া কেহ বা বাড়ীর অবশিষ্ট ধান-চালগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিল,—যাহাদের তাহাও ছিল না, তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দিনের একমাত্র সম্বল মেয়েছেলের হাত হইতে এক-আধখানা অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া কাহারও কাছে বন্ধক রাখিবার জন্য তাহারা দুয়ারে দুয়ারে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

গোবরডাঙ্গার ছোট গোমস্তা রসিক মণ্ডলকে ডাকিয়া রাসবিহারী একটা গর্ব্বের হাসি হাসিয়া কহিলেন, দেখ্‌চো হে রসিক, তোমরা বল আদায় হবে না, আদায় হবে না,—রাসবিহারী গাঙ্গুলি কি আর যে-সে ছেলে! ঝপ ঝপ করে টাকা দিয়ে যাচ্ছে! তাও তো দুটো মুখের কথা খরচ করেছি মাত্র এখনও ডাং ধরিনি।

রসিক মণ্ডলের বাঁ-চোখটায় ছানি পড়িয়াছিল ভাল দেখিতে পাইত না, কাজেই গ্রীবা হেলাইয়া দক্ষিণ চক্ষুটা ঈষৎ বাঁকাইয়া রসিক বলিল—তা বটে বাবু, আপনার মত শাসনজারি এই অমরপুরের সেরেস্তায় আর তো কারো দেখলাম না। এ একটা তারিফ করবার জিনিস।

সেদিন অপরাহ্নে ভদ্রবেশী এক প্রৌঢ় ব্যক্তি রাসবিহারীকে একটি নমস্কার করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তখন তক্তপোষের উপর বসিয়া আদায়ের ফর্দ্দে মোট জমার হিসাব কসিতেছিলেন, কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—কি চাও?

লোকটি বিনা হুকুমেই তক্তার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল,—আমায় কেন অনর্থক পীড়াপীড়ি করচেন মশায়, আমি আপনার প্রজাও নই, তার কথাও নেই। দু'দিনের তরে এসেচি আবার দুদিন বাদে চলে যাব,—নেহাৎ বিপদে পড়েই আট্‌কে গেছি, নইলে কোন্ দিন পালাতাম।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথায় যাবেন?

—আর বল্‌বেন না মশায়, পেটের দায়ে চাক্‌রি করি সে কোন্‌ সাত সমুদ্দর তের নদী পার—রেঙ্গুনে। সেখানেই যাব। কেন, সেদিন তো আমি ব'লে গেছি—এখানে সেই এককড়ি না তিন-কড়ি কে থাকেন, তিনিই সেদিন আমাকে ডাকিয়েছিলেন—বলিয়া সে বোধ করি তাহারই সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাসবিহারী বলিলেন, এখানে এককড়ি তিনকড়ি ব'লে তো কেউ থাকে না। রসিক মণ্ডল এখানকার গোমস্তা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রসিক, নামটা ভুলে গেছলুম।—এই যে! পার্শ্বস্থ দরজা হইতে রসিককে বাহির হইতে দেখিয়া যেন লাফাইয়া উঠিল।

রাসবিহারী কহিলেন, ওহে রসিক, ইনি কি বলচেন শোনো।

রসিক তাহার ডান-চোখের বাঁকা চাহনি দিয়া লোকটির দিকে একবার তাকাইয়া বলিল, শুনছি। বলিয়া সে এই ভদ্রলোকের ইতিবৃত্ত রাসবিহারীকে শুনাইতে বসিল।

ব্যাপারটা এই। লোকটির নাম পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী—এখানে তাহার বাড়ী নয়, বর্ম্মায় চাকরি করে। এই গোবরডাঙ্গা গ্রামে একটি ছোট ডাকঘর আছে, ইহার দাদা দিগম্বর চক্রবর্ত্তী অনেক-দিন হইতে এইখানেই পোষ্টমাষ্টারী করিতেছিলেন, মাসখানেক পূর্ব্বে একদিন হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সেই মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পীতাম্বর বর্ম্মা হইতে এখানে আসিয়াছে। পনর ষোল বছরের এক অবিবাহিতা কন্যা এবং ন' বৎসরের একটি ছেলে রাখিয়া দিগম্বর মারা যান। ডাকঘর সংলগ্ন যে ঘরটিতে তিনি থাকিতেন, পিতার মৃত্যুর পরও তাহারা দুই ভাই-বোনে এতদিন সেইখানেই ছিল, দিন দশেক হইল, একজন নূতন পোষ্টমাষ্টার আসিয়াছেন বলিয়া তাহাদের সেখান হইতে সরিতে হইয়াছে। গোবিন্দ মাইতির পুরাতন কোঠা বাড়ীটা মাসিক তিন টাকা ভাড়ায় তাহারা বন্দোবস্ত লইয়াছে এবং সম্প্রতি সেই খানেই বাস করিতেছে।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই রাসবিহারী পীতাম্বরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন,—এখন তাদের উপায় ? বর্ম্মায় নিয়ে যাবেন ?

একটা হাত কপালে ঠেকাইয়া এবং মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া পীতাম্বর বলিল—হায়, হায়, সে সঙ্গতি যদি থাকত মশায় ! ······তাও যদি হতভাগা বুদ্ধি ক'রে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যেত তাহ'লে বা রক্ষা ছিল। দাদাকে আমি হাজার দিন বলেছি, দাদা মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে দাও, কিন্তু সে আর কে শোনে ! ব'ল্‌তো, ভাল ছেলে পাচ্ছি না। নাও, এবার এই আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে তুমি শালা ভোগো। এখানে এসে অবধি এই দশটা দিন মশায়, বললে বিশ্বাস করবেন না, একটি পাত্রের জন্য যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কাণা-খোঁড়াও একটা মিলুক !······এবার কিন্তু এই আপনাদের মত দশজনার সাক্ষাতে বলে যাচ্ছি মশায়, আপনারা সাক্ষী, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি, এবার আমি চলে যাব। চাক্‌রীটা তো বাঁচাতে হবে মশায় ? না, এই হিড়িকে সব খোয়াব ?

গড়্‌গড়্‌ করিয়া কথাগুলা একসঙ্গে বলিয়া সে চুপ করিল।

রাসবিহারী বলিলেন—তিনি টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন ?

—মোটে সাতশো। তার মধ্যে আমি সাড়ে তিনশো নোব মশায়, আচ্ছা না হয় পঞ্চাশ ছেড়ে দিলুম, তিনশো আমার চাই-ই,—বহুৎ টাকা আমার খরচ হয়ে গেছে।

রাসবিহারী ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, তা না হয় নিলেন, কিন্তু মেয়েটি দেখতে কেমন ?

রসিক উত্তর দিল। বলিল—আমি দেখেছি। মেয়ে পরমা সুন্দরী, বোধকরি এ তল্লাটে তেমন মেয়ে হাজারে একটিও নেই।

রাসবিহারী তাচ্ছিল্যভরে কহিলেন—হ্যাঃ ! তোমার আবার চোখ ! চলো আমি দেখব। একটু থামিয়া বলিলেন—ধর, বিয়ে যদি

আমিই করি,—দেবেন মশায়? বলিয়া তিনি পীতাম্বরের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

পীতাম্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—সে কপাল কি ও করেছে?

কথাটা রসিকের বিশ্বাস হয় নাই। ক্ষণপূর্ব্বে তাহার কাণা চোখের ইঙ্গিতে সে মনে মনে একটুখানি ক্ষুন্নও হইয়াছিল, তাই হাসিতে পারিল না বটে, কিন্তু মুখে বলিল—মিছে কথা!

রাসবিহারী জোর করিয়া বলিলেন—মিছে কথা নয় রসিক, স্ত্রী আমার মর-মর হয়ে রয়েছে, আজ মরে কি কাল মরে তার ঠিক নেই। বিয়ে আমায় করতেই হবে। তা নইলে আমার সংসার যে অচল হয়ে গেল!

সত্য কথা বলার অভ্যাস রাসবিহারীর কম থাকিলেও, তাহার স্ত্রী যে রুগ্না, এ কথাটা তিনি মিথ্যা বলেন নাই!

বস্তুত সেইদিন সন্ধ্যায় রসিক এবং রাসবিহারী পীতাম্বরের সঙ্গে গোবিন্দ মাইতির পোড়ো এবং পুরাতন ভাঙা বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া মেয়ে দেখিলেন। মেয়েটির নাম মিনতি, ছেলেটির নাম কাশীনাথ। সামান্য পোষ্টমাষ্টারের এই এক নিঃসহায়া মেয়ের রূপের ঐশ্বর্য্য যে এত বেশী হইতে পারে রাসবিহারী পূর্ব্বে তাহা ধারণাও করিতে পারেন নাই,—এখন স্বচক্ষে সেই সুন্দর প্রতিমাকে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। রসিক মণ্ডল তাহাকে আর একবার দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু আজ যেন সেই মেয়েটাই তাহার চক্ষে এক অপরূপ মূর্ত্তিতে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। যেদিন সে তাহার পিতার মৃতদেহ সৎকারের নিমিত্ত পাগলিনীর মত ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া তাহার কাছারিতে গিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন যেন তাহার এই কুসুম-সুকুমার মুখখানি বেদনায় এত বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। আজ যেন সে তাহাকে আবার নতুন করিয়া দেখিল। কাণা রসিকের দক্ষিণ চক্ষুটা আনন্দে যেন লাফাইতে লাগিল, এবং স্ত্রী রুগ্না হইলে সেও বোধ করি এই

বে-ওয়ারিশ বস্তুটিকে নিজের ঘরে লইয়া যাইতে অন্ততঃ একবার চেষ্টার ত্রুটি করিত না।

তৎক্ষণাৎ দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল, এবং দিন দুই পরে অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য যে তারিখটা পঞ্জিকায় নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই তারিখেই রাসবিহারী এই পরম শুভ কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন। বিনা স্বার্থে এতবড় একটা গুরুভার বোঝা স্কন্ধ হতে নামাইয়া দিয়া পীতাম্বর নিশ্চিন্ত হইল। পরদিন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহার ন্যায্য পাওনা ভ্রাতার সঞ্চিত অর্থ হইতে তিনশোটি টাকা বুঝিয়া লইয়া চাক্‌রী বাঁচাইবার জন্য পরমানন্দে বর্ম্মা যাত্রা করিল।

যাহাতে মিনতি ও কাশীনাথের কোনরূপ কষ্ট না হয় রাসবিহারী তাহার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। গোবিন্দ মাইতির পুরাতন বাড়ীটার রূপ এবং ঐশ্বর্য্য দুই-ই বদলাইয়া গেল, নূতন ঝি-চাকর নিযুক্ত হইল, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য রসিকের উপর তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া রাসবিহারী স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। মিনতি কাহারও বিরুদ্ধে একটি কথা পর্য্যন্ত বলিল না। এতবড় দুঃসাহসিক অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া সে যেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

এদিকে গোবরডাঙ্গা হইতে রাধানগরে ফিরিয়া রাসবিহারী এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিলেন। একে তো বহুদিন হইতেই তাঁহার রুগ্না স্ত্রী, তাঁহার নিকট ছেঁড়া জুতার মতই একটা নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার সেটা যেন অসহ্য ভারের মতই তাঁহার সমস্ত দিনের কাজেকর্ম্মে তাঁহার দুইটা কাঁধ ধরিয়া দিবারাত্রি ঝুলিতে লাগিল। সেদিন রাত্রে ভারটা তাঁহার নিকট নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

স্ত্রী বলিল—হ্যাঁগা, তুমি যে কোনো চেষ্টাই করছ না,—ছোট মেয়েটার বিয়ে দিলে আমি তবু চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারি, আর ক'দিনই বা বাঁচবো ?

রাসবিহারী মনে-মনেই গর্জ্জিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

স্ত্রী কহিল—চুপ করে রইলে যে?

রাসবিহারী বলিলেন—তুমি আজই মর না বাপু,—যমের বাড়ী থেকে দেখবে। কোন কাজের একটা সময় অসময় নেই হারামজাদীর।

স্ত্রী বলিল—ওগো সেই আশীর্ব্বাদই কর,—তোমার পায়ের ওপর মাথা রেখে যেন মরতে পারি।

বিনা কারণেই রাসবিহারীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, বলিলেন—হাঁ, মর্।

—মরণ যে হয় না ছাই! এতই যদি চোখের বিষ হয়ে উঠেছি ত' মেরেই ফ্যালো না, আমি বাঁচি।

—তবে এই নে হতভাগী—বলিয়া রাসবিহারী তাহার গলাটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন। নিপীড়িতা নারীর যে ক্ষীণ দুর্ব্বল প্রাণটুক্ তাহার অস্থি এবং চর্ম্মের মধ্যে ধুক্‌ধুক্ করিতেছিল, এই কঠোর হস্তের নিষ্ঠুর পেষণ সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিমেষেই যে কোন্ ফাঁকে উড়িয়া পলাইল, রাসবিহারী তাহার বিন্দু-বিসর্গও টের পাইলেন না। বাহিরের বাতাসে ঘরের প্রদীপটাও নিভিয়া গিয়াছিল। সজল কাতর দৃষ্টিতে সে একবার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পায় নাই, কি একটা কথা বলিবার জন্য সে একবার অস্পষ্টভাবে গোঙাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু একটা কথাও তাহার বলা হয় নাই! পরক্ষণেই সমস্ত অসাড় হইয়া গেল। রাসবিহারী তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দেখিলেন, সব শেষ হইয়া গেছে—চোখ দুইটা যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে, জিভ ঈষৎ বাহির হইয়াছে, এবং দাঁত বাহির করিয়া মুখখানা কেমন যেন বিকৃত ও বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

সে রাত্রে রাসবিহারী এ-সংবাদ কাহাকেও জানাইতে পারিলেন

না। জীবিতাবস্থায় যাহাকে ভয় করা দূরে থাক্, গ্রাহ্যের মধ্যে আনাও একটা হাস্যকর প্রসঙ্গের মধ্যেই পরিগণিত হইত, আজ তাহারই প্রাণহীন নিসাড় নিস্পন্দ মৃতদেহটা সম্মুখে রাখিয়া সেই ঘরে রাত্রি যাপন করা রাসবিহারীর পক্ষে মস্ত একটা ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে তাঁহার মৃত পত্নীর চোখের বিস্ফারিত পাতা দুইটা নামাইয়া দিলেন, জিভটা আস্তে আস্তে মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া দোতলার সেই ঘরটায় তালাচাবি বন্ধ করিয়া তিনি পাশের ঘরে রাত্রি কাটাইলেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাঁহার নিজের চোখের পাতা দুইটা এক করিতে পারিলেন না। এতদিনের গৃহিণীকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া মনে মনে অনুশোচনাও যে না হইয়াছিল এমন নয়, কিন্তু মিনতির মুখখানা মনে করিয়া কোন রকমে সে দুশ্চিন্তাটাকে দুইহাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিতেছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই খবরটা সকলকে জানাইলেন। রুগ্না স্ত্রী যে তাঁহার হঠাৎ একদিন এমনি করিয়াই মারা যাইবে, সে সম্বন্ধে কাহারও আর কোন সংশয় ছিল না। রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা অভয়া তাহার পাঁচ-ছয়টি ছোট ছোট ছেলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া আসিল। বিবাহ যোগ্যা কনিষ্ঠা কন্যা অচলা তাহার মাতার মৃতদেহটা জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মানদা বলিয়া একটি বিধবা বামুনের মেয়ে বাড়ীতে রান্না করিত, এবং অভয়ার ছেলেগুলা মানুষ করিত। বাড়ীর গৃহিণীর এই অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র করিবার জন্য মুখে কাপড় দিয়া সে চীৎকার করিতে বসিল। রাসবিহারীর একটা আধ-পাগলাগোছের ছেলে ছিল, নাম এককড়ি, বয়স তাহার নয় দশ বৎসর। ছেলেটা নীচের ঘরে নিশ্চেষ্টভাবে ঘুমাইতেছিল। কান্না শুনিয়া অকস্মাৎ তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শয্যা ত্যাগ করিয়া সে উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, মানদা তাহাকে দেখিয়াই তাহার গলার সুর আরও একপর্দ্দা উঁচুতে তুলিয়া

দিয়া কান্নার সুরে এককড়িকে তাহার মাতার মৃত্যুটা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সেটুকু বুঝিবার ক্ষমতা এককড়ির ছিল। সে উদাস দৃষ্টিতে একবার তাহার মাতার কক্ষের দিকে তাকাইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, এমন সময় মানদা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেই এককড়ি তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নীচে নামিয়া আসিল, এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর অনতিদূরে একটা বাবলা গাছের তলায় মুখ নীচু করিয়া বসিয়া বসিয়া বোধকরি মনে মনেই কাঁদিতে লাগিল।

পরে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই চুকিয়া গেল এবং তাহার সপ্তাহখানেক যাইতে না যাইতেই গোবরডাঙ্গা হইতে একখানি গরুর গাড়ী করিয়া মিনতি ও কাশীনাথ আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল। ফিরে ফির্‌তি কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিয়া রাসবিহারী বুড়া বয়সে তাহার তরুণী ভার্য্যাকে পরমানন্দে মাথায় তুলিয়া লইলেন। সংসারের চাকাটা ঠিক আগের মতই বেশ নির্ব্বিবাদে এবং নিঃশব্দে ঘুরিতে লাগিল।

এইত গেল আখ্যায়িকার গোড়ার কথা। পরে যাহা হইল বলিতেছি।

দুই

পিতলের একটা ঘড়া লইয়া নদী হইতে অচলা ক্রমাগত জল বহিতেছিল। এটা তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। খাইবার, রাঁধিবার এমন-কি হাতমুখ ধুইবার জন্য বাড়ীতে যত জলের প্রয়োজন হয়, অচলা প্রত্যহ নদী হইতে তাহা বহিয়া আনে। সেদিন অপরাহ্ণে ঘরে প্রবেশ করিয়াই কাঁখ হইতে জল-ভর্ত্তি ঘড়াটা রান্নাঘরের মেঝের উপর সজোরে নামাইয়া দিয়া অচলা মুখ ভারী করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আর পারব না দিদি, পারিস্ তো এবার থেকে তুই আন্‌গে যা।

অভয়া একটু দূরে বসিয়া চা তৈরী করিতেছিল, কথাটা তার কানে যাইতেই মানদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, শোন্ মানদা, শোন্,—আবাগীর কথাটা শোন্ একবার। চার কলসী জল এনে বলে কিনা আর পার্‌ব না, তুই আনগে। ভালয়-ভালয় যা বলচি অচলি, তা নইলে আজ খেতেও পাবিনে।

অভয়ার একটা ছেলেকে মানদা মানুষ করিয়াছে, তাহাকেই কোলে লইয়া চা খাওয়াইবার জন্য একটা বাটী হাতে লইয়া সে কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার অভয়ার কাছে আরও একটুখানি সরিয়া আসিয়া গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিল, হ্যাঁ, দেবে যে ওকে খেতে,—সং-মায়ের রাজত্ব বাবা! এবার আর রা'টি করবার যো নেই!

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহার কথাটায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই বল্। আমিও তো সেই কথাই বলছি।

একটা বাটি হাতে করিয়া অচলা বলিল, দে, চা দে।

অভয়া বলিল, যা, দেব না চা,—আরও দু'ঘড়া জল আন্‌গে, তারপর দেব।

অচলা যে-কথাটা এতক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা করিতে ছিল এইবার তাহাই বলিতে হইল। বলিল, তবে ওই পরেশটাকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বারণ করে দিগে যা, তা নইলে আমি পারব না বলে দিচ্ছি!

—কেন, আজও সে তোকে ধরতে এসেছিল নাকি? বলিয়া মানদা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মুখ বিকৃত করিয়া অভয়া বলিল, আ, মেয়ের কি রূপের ছিরি, ওকে ভূতেও ছোঁবে না মানদা—শয়তানীর সব মিছে কথা!

অচলা কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে বাটিটা সরাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেল, এবং একটা বড় টবের ভিতর ঘড়ার জলটা হড় হড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া, ঘড়াটা কাঁখে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কাহার ডাকে সহসা মুখ ফিরাইয়া তাকাইতেই দেখিল, মিনতির ভাই কাশীনাথ তাড়াতাড়ি তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। কহিল, কি বল্‌চো ছোট-মামু?

সোহাগ করিয়া অচলা তাহাকে মামার পরিবর্ত্তে মামু বলিত।

কাশীনাথ বলিল, দিদি ডাকচে।

ঘড়াটা নীচে নামাইয়া রাখিয়া, কাহারও দিকে না তাকাইয়া কাশীনাথের পশ্চাতে অচলা উপরে উঠিয়া যাইতেছিল; ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া অভয়া বলিল, দেখ্‌চিস মানদা, চব্বিশ ঘন্টা ও ওই সর্ব্বনাশীর খোসামুদি করছে,—দেখলে আমার গা জ্বালা করে। কেন গা, বলি, এত কিসের?

মিনতি অচলাকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, কই, আজ যে আমায় না ডেকেই চলে যাচ্ছ?

সুমুখের জানালা দিয়া নদীর দিকে যাইবার রাস্তাটা দেখিতে পাওয়া যাইতে ছিল, অচলা এইবার সেই দিকে তাকাইয়া বলিল, যেতে কি তুমি পারবে? ঝড় উঠেছে যে!

—তা উঠুক। বলিয়া একখানা গামছা হাতে লইয়া মিনতি তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

দুই পাশে বড়-বড় বাঁশ গাছের ঝোপ, তাহার মাঝে একটি সরু পথ বরাবর নদীর ঘাটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া মিনতি ও অচলা পাশাপাশি চলিতেছিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রৌদ্রের তেজ একটুখানি ম্লান হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু পথের তপ্ত বালুকণা তখনও শীতল হয় নাই। ঝড়ের বেগ শান্ত হইয়া আসিলেও হু হু করিয়া গরম বাতাস বহিতেছিল।

মিনতি বলিল, লখু চাকরটা কি করে অচলা? সেও তো জল আন্‌তে পারে, মানদাও তো পারে?

অচলা পথ চলিতে চলিতে কহিল দিদি বলে, লখু আ-কাচা কাপড়ে জল আনে, ওতে রান্না হয় না।

অনতিদূরে একটা বোয়ান্ গাছের তলায় এক গৌরবর্ণ যুবক বসিয়া বসিয়া ঢিল ছুঁড়িতেছিল। সহসা তাহার দিকে মিনতির দৃষ্টি পড়িতেই, মাথার কাপড়টা সে ভাল করিয়া টানিয়া লইল, —অচলা বক্রকটাক্ষে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া পথ চলিতে লাগিল।

একটুখানি দূরে গিয়া মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, পরেশটাকে রাস্তা থেকে দূর করে দিতে বলছিলে, সে আবার কে অচলা?

পথপ্রান্তে গাছের ছায়ায় যে যুবক বসিয়ছিল, অচলা নীরবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

কেন, কি করেছিল? বলিয়া উত্তরের আশায় মিনতি অচলার মুখের পানে তাকাইল।

অচলার সমস্ত মুখখানা নিমেষেই লাল হইয়া উঠিল, বলিল ও কিছু নয়, এর পর শুনো।

না, আমায় এক্ষুনি বলতে হবে অচলা।

আচ্ছা চল বল্‌চি।

নদীর উপরে, কয়েকটা শ্যাওড়া-ঝোপের তলায় বেশ ছায়া পড়িয়াছিল। অচলা ও মিনতি দুজনে পাশাপাশি বসিল। মিনতি সস্নেহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এবার বল ভাই!

'ভাই' কথা বলিয়াই মিনতি একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল বলিল, না অচলা, তোকে আর আমার মা বলা হলো না। এমন একা-একা থাকলে নেই বা বল্‌লুম অচলা, লোক-জনের সাক্ষাতে বল্‌ব, কেমন?

—হ্যাঁ, তাই বোলো।

মিনতি বলিল, না ভাই, তুমি টুমি বললে চলবে না, এবার থেকে আমরা দুজনেই তুই বল্‌ব।

—বেশ। বলিয়া অচলা পরেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাপার এমন বিশেষ কিছুই নয়। কিছু জমি-জমা রাখিয়া পরেশের বাবা-মা মরিয়া গেছে। ছেলে বেলায় তাহার মত দুর্দ্দান্ত ছেলে গ্রামে আর একটিও ছিল না। তাহার প্রহারের ভয়ে গাঁয়ের অন্যান্য ছেলে-মেয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। অচলাও তাহার সহিত এক পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়াছে এই সেদিন পর্য্যন্ত। তাহার সহিত আম, জাম, পেয়ারা, কত কি চুরি করিয়া বেড়াইয়াছে। নিজে না খাইয়া পরেশ তাহার অপহৃত কিংবা লুণ্ঠিত বস্তুর অধিকাংশই অচলার আঁচলে ঢালিয়া দিত এবং এই পক্ষপাতিত্বের জন্য গ্রামের দুষ্টু ছেলে-মেয়েগুলা তাহাদের কাল্পনিক ভাবী-সম্বন্ধটা মুখে-মুখে একপ্রকার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়াই ফেলিয়াছিল। পরেশের ক'নে বলিলে অচলা রাগিয়া জ্বলিয়া যাইত, আর অচলার বর বলিলে পরেশ ত' তাহাকে মারিয়া খুন করিয়া ফেলিত, কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলো এমনি শয়তান যে, এত মার খাইয়াও সুযোগ পাইলে কেহই একথা বলিতে ছাড়িত না।

এই মাতৃ-পিতৃহীনবালকের উপর লোভ না থাকিলেও তাহার জমিজমাগুলির উপর রাসবিহারীর বেশ লোভ ছিল। তাই লোক-পরম্পরায় এই সম্বন্ধের কথাটা তাহার কাণে উঠিলে তিনি বরং সম্মতি দিয়াই বলিতেন, হ্যাঁ, তাই মনস্থ করেছি। কিন্তু তাহাকে জামাতা করিবার কৌশল অপেক্ষা তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার কূট কৌশলটাই রাসবিহারী ভাল জানিতেন বলিয়া সম্পন্ন করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। হঠাৎ একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, পরেশের থাকিবার আশ্রয়টুকু ছাড়া তাহার বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই নিলাম হইয়া গিয়াছে এবং অভয়ার স্বামী হিতলাল বন্দোপাধ্যায়ের নামে রাসবিহারী সে নিলামের সম্পত্তি ডাকিয়া লইয়াছেন। পরেশ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। অনেকে তাহাকে অনেক পরামর্শ দিল কিন্তু সে তাহাদের কোন কথা না শুনিয়াই একদিন গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বদিন পথের ওই বাঁশতলায় অচলার সহিত তাহার নাকি দেখা হইয়াছিল এবং সে যে বিদেশে চাকরী করিতে যাইতেছে, এই একটিমাত্র কথা, একমাত্র অচলাকেই সে জানাইয়া গিয়াছিল। অচলা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদে নদীর দিকে ছুটিয়াছিল। তাহার পর, দুই মাসের বেশী পরেশের একটা চাকরীও টেঁকে না, সে যায়, আবার হঠাৎ একদিন গ্রামে ফিরিয়া আসে, আবার খাইতে না পাইলেই চলিয়া যায় আবার আসে। তাহার ছেলে-বেলার দুরন্তপনা এখন সব থামিয়া গেছে—গ্রামে আসিলেই সে বিনা কারণে এই নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নদীতে একাকী মাছ ধরিতে বসে, কাহারও সহিত কথা বলে না, —কি যে করে কেহ বুঝিতেই পারে না। কোথায় কোন্ পশ্চিমের শহরে চাকরী করিতে গিয়া, কোথায় কোন হোটেলে পড়িয়া বসন্তরোগে সে নাকি মর-মর হইয়াছিল—তিন চার মাস পরে এবার

এই সেদিন সে গ্রামে ফিরিয়াছে। কালও পরেশ রাস্তার ধারের ওই ঢিপিটার উপর বসিয়াছিল। অচলার সহিত দেখা হইতেই সে বলিল, কিরে অচি, কেমন আছিস? আমার তো ভাই বসন্ত হয়েছিল।

লজ্জায় অচলার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, রাস্তার ধুলো আগুনের মত গরম, এই সুবাদে আর কিছু না শুনিয়াই অচলা ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

আজও দুপুরে সারাটা রৌদ্রের বেলা পরেশ এই উত্তপ্ত ধুলা-মাটির উপর দিয়াই নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছিল,—নদীর তপ্ত বালুকণা ঘূর্ণী বাতাসে উড়িয়া আসিয়া বারুদের ছিটার মত গায়ে আসিয়া বিঁধিতেছে কোমরে জলের কলসী লইয়া অচলা একবার হোঁচট্ খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। চোখে-মুখে ধূলা ঢুকিয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে,—পায়ের নীচে ধরিত্রী যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে মাথার উপর সূর্য্যের রশ্মি আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে,—অচলার কান্না পাইতেছিল, এতখানি পথ হাঁটিয়া গিয়া সে যে কেমন করিয়া বাড়ী পৌঁছিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় পরেশ কোথা হইতে ছুটিয়া তাহার ঘড়াটা কাড়িয়া লইল এবং জোর করিয়া তাহাকে ওই বড় তেঁতুল গাছটার তলায় টানিয়া লইয়া গিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল,—খবরদার অচলি, যদি কাল থেকে এই রোদের সময় জল নিতে আসবি ত তোর ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব। তোর ওই সৎ মা-মাগী তোকে মেরে ফেল্‌বার যোগাড় করেছে, নয়? ইত্যাদি ইত্যাদি। এত বড় মেয়ের গায়ে হাত দিয়াছে কোন সাহসে?—এই অভিমানে অচলা লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল এবং নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে ঝড় থামিলে কল্‌সীটা তুলিয়া লইয়া

অচলা বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া পরেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আবার আস্‌ব, ঠ্যাং খোঁড়া কর একবার, দেখি কেমন মজা! এই বলিয়া অচলা কাঁদিয়া ফেলিল। বাড়ীর দরজায় চোখের জল ভাল করিয়া মুছিয়া দিদিকে বলিয়া দিল ওই পরেশটাকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বারণ ক'রে দিগে যা, তা নইলে আমি পারব না জল আনতে।

কথাগুলা শুনিয়া মিনতির চোখ দুইটা অকারণেই ছল-ছল করিয়া উঠিল। সম্মুখে কয়েকটা তাল গাছের ফাঁকে রক্তবর্ণ সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছিল,—পশ্চিমদিকে আকাশের গায়ে মনে হইতেছিল, কে যেন আগুন ধরাইয়াছে। তাহারই খানিকটা রশ্মি মিনতির চোখে-মুখে আসিয়া পড়িল।

অচলা বলিল, আবার বলে কিনা সৎ-মা সর্ব্বনাশী—সে কথা কে না বলবে অচি? বলিয়া মিনতি তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া তাহার মুখখানা নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিল।

মিনতির এই সুন্দর মুখখানি এবং তার চেয়েও স্নিগ্ধসুন্দর দুটি চক্ষের সজল কাতরতার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া পরম বিস্ময়ে অচলা একেবারে মুগ্ধ নির্ব্বাক হইয়া গেল।

তিন

অভয়াই বাড়ীর এক প্রকার কর্ত্রী হইলেও কুশিক্ষা এবং কুসংস্কার তাহাকে এমনি স্বার্থপর এবং অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, নিজের ছেলে মেয়ে এবং স্বামী ছাড়া বাহিরের কোন বস্তু কোনদিন তাহার নজরেই পড়িত না। স্বামী ছিল, কিন্তু স্বামীর ঘর-বাড়ী কিছুই ছিল না; রাসবিহারী তাহাকে কোন্ একটা মহলে সামান্য বারো টাকা বেতনের একটা গোমস্তার চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, হিতলালকে অধিকাংশ সময় সেখানেই থাকিতে হইত। কাজেই বিবাহের পর হইতে অভয়া শ্বশুরবাড়ী কোনদিন দেখে নাই এবং অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় সংসারের ইহাই সে সার বুঝিয়াছিল যে, বাপের বাড়ীতে যতদিন আছে, ছেলেমেয়েগুলাকে লইয়া নিজ পেট ভরিয়া দুবেলা খাইয়া মাখিয়া লইবে,—অপরে কি করিল না-করিল, খাইতে পাইল কি না পাইল, সেদিকে তাকাইবার প্রয়োজন তাহার নাই। মানদা ছিল অভয়ার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের লোক, এবং তাহার একটা ছেলেকে সে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে, কাজেই সেও ছিল তারই দলে। অচলা বড় হইয়াছে, সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খটিয়া, দিদির গাল-মন্দ নির্ব্বিবাদে সহ্য করে এবং ঝগড়া-ঝাটি করিয়া কোনরকমে দুবেলা নিজের পেট ভরায়। রাসবিহারী থাকিতেন নিজের কাজে, একমাত্র টাকা ছাড়া অন্য চিন্তা সম্প্রতি তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—জানিতেন, অভয়া আছে, সে নিশ্চয়ই সব দিক দেখা-শোনা করে। মাঝে পড়িয়া সেই আপন-ভোলা পাগল ছেলে এককড়িটাই সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া যায়। একমাত্র লখু চাকরটার উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া সকলেই

পরম নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ করিয়াই থাকে। গ্রামে একটা মাইনর স্কুল আছে, এককড়ি প্রত্যহ সেখানে পড়িতে যায়, কিন্তু কি পড়ে না-পড়ে সে কথা কেহই জানে না ; ক্ষুধা যে তাহার কখন পায় এবংকি যে কখন খায়, সেদিকে কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেলে তাহারও যে একটা দ্বিতীয় বস্ত্রের প্রয়োজন, সে কথা ভুলিয়াও কোন দিন কেহ ভাবে না বলিয়া ছেঁড়া এবং ময়লা কাপড় পরিয়াই এককড়ি আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। অচলা তাহাকে কোনদিন কোন কথা বলিতে গেলে হাতের কাছে ঘটি-বাটি যাহা পায় তাহাই উঠাইয়া তাহাকে মারিতে আসে, কাজেই সেও আর তাহাকে কোনদিন কোন কথা বলে না। প্রথম আসিয়াই এই অযত্ন-পালিত মাতৃহীন ছেলেটার উপর মিনতির দৃষ্টি পড়িল এবং প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার প্রতি কেমন যেন একটা মমতা জন্মিয়া গেল।

মিনতি একদিন কাশীনাথকে দিয়া এককড়িকে ডাকিয়া পাঠাইল। এককড়ি তাহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া আসিলে মিনতি তাহাকে কোলের কাছি টানিয়া আনিয়া বলিল, হ্যাঁরে এককড়ি, তুই আমায় চিন্‌তে পারিস ? আমি কে তুই বল দেখি।

এককড়ি দেয়ালের একটা ছবির পানে তাকাইয়াছিল, বলিল, জানি। ছাড়ো, আমি ছবিটা দেখি।

—না, আগে বল, তারপর ছাড়ব। বলিয়া মিনতি তাহাকে আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

এককড়ি ধীরে ধীরে বলিল, সৎ-মা।

সৎ-মা কথাটা তাহার ভাল লাগিল না, মিনতি বলিল, কে বল্‌লে এককড়ি ?

এককড়ি কহিল, মানদা বল্‌লে, তুমি সৎ-মা হও, তোমার কাছে যেতে নাই।

মিনতির অষ্টাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, কিন্তু সে-জ্বালা দমন করিয়া ঈষৎ

হাসিয়া মিনতি বলিল, ওর কথা শুনিস না একক‌ড়ি আমি তোর মা হই। কেন আমায় চিন্‌তে পার্‌চিস্ না রে? সেই আমার অসুখ হয়ে রোগা হয়ে গিয়েছিলুম, তারপর গঙ্গা স্নান কর্‌তে গিয়ে সেরে এসেছি।

এককড়ি এইবার মিনতির মুখের পানে তাকাইল। এমন সুন্দর মুখ সে জীবনে কোনদিন দেখে নাই,—এ তাহাব মা না হইয়া যায় না। মানদার নিষেধ সে ভুলিয়া গেল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ,—মা।

—তবে আজ থেকে মা ব'লে ডেকো। যখন যা দরকার হবে আমার কাছে এস, আমি দেব। কেমন? বলিয়া মিনতি তাহার গণ্ডে একটি চুম্বন করিল।

এককড়ি বলিয়া উঠিল, দেবে? কই একটা হাঁস দাও দেখি? দেখি কেমন মরদ্?

কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মিনতি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, হাঁস এসময় কোথায় পাবরে ক্ষ্যাপা ছেলে? আচ্ছা আনিয়ে দেব।

—না, না, এক্ষুনি জলে ভাসাব। বলিয়া অদূরে দণ্ডায়মান কাশীনাথকে উদ্দেশ করিয়া এককড়ি কহিল, এই, তুই হাঁস আঁকতে জানিস্?

মিনতি বলিল, ও কে জানিস্ এককড়ি?

এককড়ি বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা জানি, কেশো।—যা না তুই একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয় না?

কাশীনাথ বুঝিতে পারিয়াছিল, সে কাগজ ও পেন্সিল আনিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। জীবন্ত হাঁস নয়, শুধু কাগজের উপর একটা হাঁস তাহাকে আঁকিয়া দিতে হইবে, মিনতি এতক্ষণে কথাটা বুঝিতে পারিল; বলিল, আচ্ছা হাঁস আমি তোমায় এঁকে দিচ্ছি, কিন্তু ওকে কেশো বল্‌তে নেই, ও তোমার ছোট মামা হয়। ওকে মামু বোলো।

এককড়ি বলিল, নন্দা কাল একটা পাখী মেরেছিল, কেমন করে' দেখ্‌বে ? চোঁ—ও-ও। বলিয়া যতক্ষণ তাহার দম থাকিল, ততক্ষণ সে এই কথার সুর টানিতে লাগিল। পরে ঢিল ছুঁড়িবার ভঙ্গী করিয়া হাতটা উপর দিকে তুলিয়া বলিল, ফট্‌! না, তুমি বুঝতে পারলে না,—এই যে ছবিটা রয়েচে, এইটা ধরো পাখী, আর এই গ্লাসটা হচ্ছে ঢিল। বলিয়া গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া এককড়ি ছবিটার দিকে ছুঁড়িতে যাইবে, মিনতি তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল হয়েছে আয় হাঁস এঁকে দি।

কাশীনাথ ইতিপূর্ব্বে তাহার বই, শ্লেট, খাতা পেন্সিল সমস্তই লইয়া হাজির হইয়াছিল।

কাশীনাথের একটা বাংলা বই লইয়া মিনতি বলিল, এটা পড়তে পারিস্‌ এককড়ি ?

এককড়ি বলিল, না, আমি পড়ি না, তুমি আগে হাঁস এঁকে দাও। কাশীনাথ বলিল, ও রোজ স্কুলে 'নিল ডাউন' হয় দিদি,—

এককড়ি মুখ ভ্যাঙচাইয়া বলিল, হ্যাঁ, নিল-ডাউন হয়! তোর কথাতেই ? শালা মাষ্টার আমায় পড়ায় না,—বলে, তোর কিছু হবে না। শুনিস্‌ নি ?

মিনতি বলিল, ছি এককড়ি, লোকে বল্‌বে কি ? তুমি মাষ্টারদের গালাগালি দাও ? বল আর কখ্‌খনো বলবে না ?

—না, বোলব না।

কাগজের উপর যেমন-তেমন করিয়া মিনতি একটা হাঁস আঁকিয়া দিতেই কাশীনাথকে লইয়া এককড়ি বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে লখুকে ডাকিয়া মিনতি বলিল, তুমি একবার স্কুলে যাও লখু। একজন ভাল মাষ্টারকে বলো, আজ থেকে এককড়িকে সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা ঘরে পড়িয়ে যাবে।—আর তার কাপড় জামা যা-কিছু আছে আমার কাছে এনে দাও।

অনতিকাল পরে দুইখানা ময়লা কাপড়, একটা ছেঁড়া গেঞ্জি এবং একটা শতছিন্ন সার্ট লইয়া লখু ফিরিয়া আসিল, বলিল, এর বেশী তো আর কিছু নেই মা। যা ছিল সব এনে দিলুম।

—কেন, আর নেই কেন? ওর বাবাকে বলনি কেন?

লখু বলিল, যখন চেয়েচি, বাবু তো এনে দিয়েছেন মা, তবে কিনা—যাক্, সে সব আর শুনে কাজ নেই, এককড়ি আমার ওই ছেঁড়া কাপড়-জামা পরেই বেঁচে থাক! আমি অনেকদিনের চাকর মা ছেলেবেলা থেকেই ওই ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছি, কিন্তু মানুষ কি আর করতে পেরেছি মা, আমরা ছোট নোক, যেমন পেরেছি তেমনি—বলিতে বলিতে লখু ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মিনতি কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, কি কথা আমার শুনে কাজ নেই বলছিলে লখু? বল, তা না হ'লে আমি নূতন মানুষ, একে সম্পর্ক খারাপ,—না, তুমি বল।

লখু বলিল, কিছু না মা! এই আমাদের বড় দিদিটির বড় ছোটলোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে মা, তাই বলছিলুম, এককড়ির নূতন কাপড়-জামা সবই সে তার ছেলেদের জন্য চুরি ক'রে নুকিয়ে রাখে,—চাইতে গেলে বলে, ও ছিঁড়ে দেবে, কি জন্যে দিবি ওকে। আর নয় ত' পষ্ট জবাব দেয়, বলে—নেই।

—পার তো আর একবার চেয়ে দেখো, নইলে আমি আনিয়ে দেব। বলিয়া মিনতি চুপ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে নীচ হইতে কান্নার শব্দে তাহার চমক ভাঙিল। অভয়া চীৎকার করিতেছিল,—ও মাগো, হতভাগী মরে যে আমাদের সর্ব্বনাশ করে গেলি গো! তোর সোণার সংসারে কে এক রাক্ষুসী এসে বসলো দেখে যা গো! আমাদের চোর ব'লে কোন্‌দিন বাড়ী থেকে খেদিয়ে দেবে যে গো! তোর ছেলের কাপড়-জামা তার ভাইকে পরাবে গো!

সতী-লক্ষ্মীর গর্ভে যদি আমার জন্ম হয় মা গো, তাহ'লে ওই ভাইএর মাথা খেয়ে সব্বনাশী যেন ত্ব'মাস না পেরোয় গো!

মিনতির আর শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না। ধীরে ধীরে সেদিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া নিজের পোড়া কপালের কথাই ভাবিতে লাগিল।

সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম এতকাল ধরিয়া মিনতি নিজের হাতেই করিয়া আসিয়াছে, আজ হঠাৎ একেবারে গৃহিণী সাজিয়া এই বয়সেই নিতান্ত প্রবীণার মত বসিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগে না, অথচ, নীচে গিয়া কাজ করিতে গেলে অভয়া এবং মানদা হাঁ-হাঁ করিয়া তাহার হাতের কাজ কাড়িয়া লয়, কাজেই কখনও বা অচলার সহিত নদীতে গিয়া তাহার জলের কলসীগুলা দরজা পর্য্যন্ত বহিয়া আনে, আবার কখনও বা অচলাকে লইয়া এই উপরের ঘরে বসিয়া বই পড়ে।

সন্ধ্যার পরেই আফিং এবং চা সেবন করিয়া কাছারী-বাটীতে দাবা খেলিবার জন্য একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন হাতে লইয়া রাসবিহারী বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরেই মাষ্টার আসিয়া বাহিরের ঘরে এক-কড়িকে পড়াইতে বসিল। অচলাকে ডাকিবার জন্য মিনতি জানালার নিকট সরিয়া আসিতেই শুনিতে পাইল, অভয়া বলিতেছে, দেখেচিস্ মানদা, আমি কি সাধ ক'রে বলি,—নিজের ভাইয়ের জন্য মাষ্টার এল, আর বলে কিনা এককড়ির মাষ্টার! বাবার এত বিষয়-সম্পত্তি সব পরভোগা হলো মানদা, মাথা ঠুকে আমার মরতে ইচ্ছে করে।

—ওসব মাষ্টার-ফাষ্টার কিছু নয় অভয়া, বিদ্যে যে ওতে বেশী হয় তা নয়, তবে কিনা এম্‌নি তু' একটা পর-পুরুষ বাড়ীর মধ্যে আসা-যাওয়া না করলে ওসব বেলোয়ারী বিবির মন বসে না, শুনলি তো আসল কথা! এই বলিয়া মানদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই নিষ্ঠুর হাসি মিনতিকে কাঁদাইয়া ফেলিল। সে আর অপেক্ষা

করিতে পারিল না, দুপ্ দুপ্ করিয়া নিজেই নীচে নামিয়া আসিল। লখু কিংবা অচলার সন্ধানে মিনতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, কিন্তু কাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে উঠান হইতে সে নিজেই ডাকিল, কাশীনাথ!

অভয়া ঘরে ঢুকিয়া মানদাকে ইঙ্গিত করিয়া অবাক্ হইয়া গালে হাত দিল। মানদা বলিল, অত জোরে চেঁচিও না বউ! কেউ শুনতে পাবে যে! এবং পরক্ষণেই অভয়ার দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা শহর-বাজারের মেয়ে, তুমিই বা কেমন ক'রে জানবে বৌ, যে, অত ঢং-ঢাং দেখলে পাড়াগাঁয়ে দশজনা দশকথা বলে!

দিদির কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাশীনাথ সন্ত্রস্তে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিল।

—বই নিয়ে এসে পড়বি আয়। কেন তুই আমায় জিজ্ঞেস ক'রে এলিনে হতভাগা! বলিয়া মিনতি যেমন আসিয়াছিল তেমনি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল।

উপরের ঘরে অচলাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মিনতির সমস্ত জ্বালা যেন নিমেষেই শীতল হইয়া গেল। একটুখানি হাসিয়া অচলার হাতখানি চাপিয়া ধরিতেই অচলা কহিল, ছোট মামুকে ডেকে আনলে কেন, তুমি ওকে পড়াতে পারবে?

—আমাকে কি এতই মূর্খ ভেবেচিস্ অচি, যে, ছোট ভাইটাকে পড়াতে পারব না? বলিয়া মিনতি তাহাকে তাহার খাটের উপর টানিয়া আনিল।

অচলা তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, ওদের কথায় রাগ করো না তুমি—ওরা এমনি বলে।

মিনতি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, না অচলা, রাগ করবার, বিদ্রোহ করবার একটা সত্যিকারের সুযোগ আমার পেরিয়ে গেছে,—

মুখ বুজে সে-সময় যখন সইতে পেরেছি, তখন রাগ-অভিমান জীবনে বোধহয় আর কখনো করব না।

তেমনি ভাবে মুখ রাখিয়াই অচলা বলিল, কই, আজ যে আমায় পড়ালে না?

অচলার মুখখানা মিনতি তাহার বুকের উপর আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বুড়ী-মেয়ের মত আজ তোকে একটা ভাল কথা বলি শোন্! মেয়েদের কাছে বিশ্বের স্নেহের ভাণ্ডার গচ্ছিত আছে অচলা, আপন-পর না ভেবে দু'হাত দিয়ে তা বিলিয়ে দিস্, আর কাউকে কোন দিন হিংসা করিস্‌নে,—শুধু এই দুটো কথা যদি মনে রাখতে পারিস্ অচি, তাহ'লে অনেক বই পড়ার ফল একসঙ্গে হয়ে যাবে।

এমন সময় 'দিদি' বলিয়া কাশীনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—যা, পাশের ঘরে গিয়ে কালকের পড়া তৈরী করে নে। বলিয়া মিনতি লণ্ঠনটা তাহার হাতের নিকট আগাইয়া দিল।

চার

কয়েকদিন পরে, সেদিন রাত্রে রাসবিহারী আহারাদির পর তামাক টানিতে টানিতে উপরে উঠিতেছিলেন, সিঁড়ির পাশে কাশীনাথকে দেখিয়া কহিলেন, কি হে, কাশীবাবু যে!

কাশীনাথ ঈষৎ হাসিয়া তাহার ভগিনীপতির মুখের পানে একবার তাকাইয়াই পুনরায় দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল।

রাসবিহারীও যে তাহাকে বিশেষ-কিছু বলিবার জন্য সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরম স্নেহে কাশীনাথের মাথায় গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, বেশ পড়চো তো? যাও। এই বলিয়া হৃষ্টচিত্তে তিনি তাঁহার উপরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ব্যাপারটা অভয়া ও মানদার চক্ষু এড়াইল না। রাসবিহারী উপরে উঠিয়া গেলে মানদা বলিল, বুড়ো বয়সে ভীমরথী ধরেছে, তা নইলে, কই নিজের ছেলেটাকে তো কোনদিন আদর করতে দেখলুম না অভয়া!

অভয়া বলিল, করবে না কেন মানদা, করত্তো,—যেদিন থেকে এঁরা এসে ঢুকলেন, সেইদিন থেকেই সব গেল।

মিনতি ও অচলা ভাত খাইয়া খিড়কির পুকুরে হাত ধুইতে গিয়াছিল; তাহারা যে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকার বারান্দার উপর দাঁড়াইয়াছিল, কেহই তাহা দেখিতে পায় নাই।

মিনতি উপরে উঠিয়া গেল। রাসবিহারী বিছানার উপর কাৎ হইয়া পরমানন্দে হুঁকা টানিতেছিলেন। মিনতিকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে কি একটা রসিকতা করিতে গেলেন, মিনতি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ওগো, কাশীনাথকে অত বেশী আদর দিও না। আর সত্যিই

তো, সেটা বেশী ভালো দেখায় না। এককড়িও তো রয়েছে, তার পানে তো কোনদিন ভুলেও তাকাও না।

রাসবিহারী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এই নিয়ে নিশ্চয় তোমার কেউ কিছু বলেছে। তার নামটা একবার বল তো দেখি, আমি দেখে নিচ্ছি তাকে।

মিনতি বলিল, না গো না, আমায় কেউ কিছু বলেনি। আমি শুধু এইজন্যে বললুম যে ও যদি বুঝতে পারে, দিদির বাড়ীতে দিব্যি আরামে আছে, তার আর কোনও ভাবনাই নেই,—তাহ'লে সে আর কোনদিন মানুষ হতে পারবে না। এটা যে তার নিজের বাড়ী নয়, সেইটেই তাকে বুঝতে দাও।

হুঁকাটা বারকতক টানিয়া রাসবিহারী বলিলেন, ওঃ, নাও নাও, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, কাশীনাথের ঘর-বাড়ী জমি-জায়গা আমি সব ক'রে দেব।

কথাটা শুনিয়া মিনতি মনে-মনে হাসিল। বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় পক্ষ ঘরে আনিলে মানুষের যে মতিভ্রম হয় এবং ইহা যে নিছক্ খোসামুদির কথা, মিনতির তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। বলিল, আমার কাছে বললে সেই ভাল, কিন্তু আর কক্‌খনো একথা মুখে এনো না। সে যদি মানুষ হতে পারে, নিজে সব করে নেবে, তবে এখন মাত্র গরীবের ছেলে ব'লে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিও, তার জন্যে সে তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

রাসবিহারী কহিলেন, থাক্। তোমার ও ধর্ম্মের বক্তৃতা আর শুনতে চাই না, হুঁকোটা ওই এককোণে ঠেসিয়ে রাখ দেখি। বলিয়া হাত বাড়াইয়া হুঁকোটা তিনি মিনতির হাতে দিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। একটা আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আজ একটা এমন দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলুম, একটু ফুর্ত্তি করব, না কোথা তুমি এসে একটা বাজে কথা পেড়ে বসলে।

বিছানার নিকট সরিয়া আসিয়া মিনতি বলিল, কি রকম, শুনি।

—এসো, এসো, উঠে বসো, তারপর বলছি। বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। মিনতির সর্ব্বশরীর রী রী করিয়া উঠিল, তথাপি সে কোনরকমে তাহারই পার্শ্বে উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি বল।

—অচলার বিয়ের সব ঠিক করে ফেল্‌লাম,—এই মাসের আটাশে, মাঝে আর পনেরোটা দিন।

আগ্রহ সহকারে মিনতি প্রশ্ন করিয়া বসিল, কোথায় গো?

রাসবিহারী গর্ব্বের হাসি হাসিয়া কহিলেন, শুনলে অবাক্ হবে মিনতি, ধন্য আমি, ভাই সে চামারকে রাজি করেছি। জামাই বি-এ পড়ছে, দেখতেও খুব সুন্দর।

মিনতি বলিল, হ্যাঁগা, এখানে এসে শুনলুম, পরেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ করেছিলে, তারই সঙ্গে বিয়ে দাও না।

—আরে দূর! দূর! সেটা কি আর মানুষ! এক কাঠা জমি জমা নেই, গণ্ড মুখ্‌খু।

মিনতি কহিল, আর তোমার মেয়েকেই বা কি এমন লেখাপড়া শিখিয়েছ? পরেশের সঙ্গেই দাও, অচলা সুখী হবে। সমানে সমানেই ভালো।

রাসবিহারী বলিলেন, মেয়েদের আবার লেখাপড়া! শিখে কি হবে শুনি? চাক্‌রি কর্‌বে, না, উকিল হবে! এই তো তুমিও লেখা-পড়া শিখেছ, এখন তো সব শিকেয় তোলা রইলো। ও সব ভুল! ও সব ভুল! তিন শ' টাকায় কন্যাদায় থেকে খালাস্‌,—একি কম কথা মিনতি?

মিনতি চুপ করিয়া রহিল। রাসবিহারী বলিতে লাগিলেন, চুপ ক'রে রইলে যে? শোন। পাথরোলের সতীশ চৌধুরী তমসুক লিখে আমার কাছে থেকে তিন শ' টাকা কর্জ্জ নিয়েছিল। সুদে-আসলে

আজ প্রায় দেড় হাজারের উপর দাঁড়িয়েছে। টাকা পাবার আর কোনো আশা-ভরসাই ছিল না, দেখ্‌লুম ছেলেটা তার কলকাতায় বি-এ পড়ছে, এই সময় একটু কড়াকড়ি ক'রে ধরে বস্‌লেই হয়ে যায়। ব্যাস্, এক কথাতেই কাজ খতম্। আমার একটি পয়সাও লাগ্‌বে না, উল্টে—বিয়ের খরচটা সুদ্ধ তার কাছ থেকেই,—তমসুকটা বিয়ের রেতে ছিঁড়ে ফেলব, আর কি চাই!

এই বলিয়া রাসবিহারী হাসিতে লাগিলেন।

মিনতির আর কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল না, তথাপি বলিল, দ্যাখো, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে পাড়াগাঁয়ের ছেলে ওই পরেশের সঙ্গেই দিলে ভাল হয়। একজন লেখাপড়া জানা আর একজন নিরক্ষর হলে বড় বিশ্রী গর্‌মিল হয়ে যায়, সব সময় তারা সুখী হতে পারে না। আর বিশেষতঃ অচলা তেমন—

রূপসী নয়, এই কথাটাই বলিতে গিয়া মিনতি সহসা থামিয়া গেল।

রাসবিহারী তাহা বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, আচ্ছা বাপু তাহা না-হয় ধরে নিলাম; কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া জানো বোধকরি আমার চেয়ে একটুখানি বেশীই জান, কিন্তু আমাদের কোন্‌খানটায় গর্‌মিল হয়েছে শুনি? তাও তো বয়সের এত তফাৎ। বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া মিনতির গলাটা জড়াইয়া ধরিলেন।

ফাঁসির রজ্জু গলায় আসিয়া পড়িলে সে বন্ধন মোচন করিবার শক্তি যেমন দণ্ডিত ব্যক্তির থাকে না,—মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই তাহাকে যেমন ফাঁসির মঞ্চের উপর নির্ব্বিকার নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়,—মিনতির অবস্থাও নিমিষেই ঠিক তেমনি হইয়া গেল। অসহ্য বোধ হইলেও স্বামীর সে হস্ত সরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত সে করিল না, এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য যে কোন্‌খানে, সে-কথা বুঝাইবার জন্য একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিল না,—যেমন নিশ্চেষ্ট

ভাবে শুইয়াছিল, তেমনি শুইয়া রহিল। উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া একবার সে বাহিরের পানে তাকাইল, মসী-গাঢ় সে বিরাট অন্ধকারে সমস্তই যেন একাকার হইয়া গেছে,—আকাশে নক্ষত্র আছে কি না আছে, সেখান হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাসবিহারী তাহাকে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া প্রশ্ন করিলেন, মিনতি, ঘুমোলে নাকি?

প্রত্যুত্তরে মিনতি শুধু প্রাণপণ শক্তিতে একটা ঢোক্ গিলিয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল, না।

নেশাখোর মানুষের চোখে লাগিবে বলিয়া আলোটা খাটের নীচে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছিল, নচেৎ মিনতির এই সময়কার মলিন পাণ্ডুর মুখের চেহারা দেখিলে রাসবিহারীও বোধকরি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন।

পাঁচ

অবশেষে পাথরোলের সতীশ চৌধুরীর ছেলেকেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাসবিহারী তাঁহার তমস্সুকের টাকাটা উশুল করিয়া লইলেন। জামাইটি দেখিতেও বেশ সুশ্রী-সুন্দর, শুনিতেও বি-এ পড়ে, বাপের অবস্থাও বেশ সচ্ছল, নাম নলিনীকান্ত।

রাসবিহারী ইতিপূর্ব্বে জামাইটিকে চোখে না দেখিলেও মিনতির নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিলেন,—দেখ্‌লে মিনতি, তুমি বল্‌ছিলে পরেশ আর পরেশ,—এ বাবা আমার চোখ, একেবারে হীরের টুক্‌রোটি খুঁজে খুঁজে বের করেছি। বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার চোখের গর্ব্বে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

বস্তুতঃ, নলিনীকান্তকে দেখিয়া মিনতিরও আনন্দ হইয়াছিল। পরেশ হয়ত তাহার এই রূপের আড়ালে আত্মগোপন করিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, অচলা তেমন সুশ্রী নয়, জামাইএর তাহাকে মনে ধরিবে কিনা; এবং সেজন্য অচলা যেদিন শ্বশুরবাড়ী যায়, মিনতি তাহাকে অনেক কথাই শিখাইয়া দিয়াছে এবং তাহারা সুখী হউক বলিয়া ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে সে যে কতবার প্রার্থনা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই ভবিষ্যতের কথা এখনও ঠিক করিতে না পারিলেও, জামাই যে প্রিয়-দর্শন, মিনতিকে সে কথা স্বীকার করিতে হইল। রাসবিহারীর প্রশ্নের উত্তরে সে হাসিতে হাসিতে বলিল, হ্যাঁ, জামাই বেশ ভালই হয়েছে। তোমার চোখ আছে!

চোখের প্রশংসায় আরও একটুখানি খুশী হইয়া রাসবিহারী কহিলেন, দাম আছে, দাম আছে মিনতি, এ-চোখের দাম আছে। তোমাদের গোবরডাঙ্গার কানা রসিক একদিন বলেছিল, পোষ্ট-মাষ্টারের মেয়েটি

আমি দেখেছি, সুন্দরী বটে। আমি বল্‌লুম, দূর শালা, তোর আবার চোখ, চল্‌ আমি দেখ্‌ব।—বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি আবার বলিলেন,—জহুরীতেই পাথর চেনে। কই, আমি ছাড়া এতদিন তোমাকেও তো কেউ চিন্‌তে পারেনি মিনতি? এই চোখ দুটোই তো তোমায় সেদিন—

—হ্যাঁ, আমার সর্ব্বনাশ, তোমার ওই চোখ-দুটোই করেছে বটে! বলিয়া মিনতি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু এই হাসির তলে কত বড় প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকাইয়া সে যে এই কঠোর সত্য কথাটা বিদ্রূপের ছলে তাহার মুখের উপর বলিয়া দিয়া গেল, রাসবিহারী আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহা বুঝিতে পারিলেন না, বসিয়া বসিয়া আপন মনেই হাসিতে লাগিলেন।

অভয়া অচলাকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। জামাই দেখিয়া তাহারও মনে হিংসা হইল। এমন-কি, বিশ্ব-নিন্দুক মানদাও স্বীকার করিল, তা যে যা বলে বলুক্‌ অভয়া, জামাইটির নাক-মুখ-চোখের গড়ন আছে। আমি ও' বরাবর বলে এসেছি, কুরূপ কুচ্ছিৎ মেয়ের বর ভাল হয়,—অচ্‌লির কপাল!

স্বীকার করিল না শুধু হিতলাল। কানে সে একটু কম শুনিত বলিয়া তাহার নিজের গ্রামে সকলেই তাহাকে 'কালাহাতী' আখ্যা দিয়াছিল। জামাই সম্বন্ধে কে যে কি বলিতেছে, সে-সব কথা সে শুনিতে পাইল না; নলিনীকান্তকে উদ্দেশ করিয়া যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, মাথায় অমন্‌-টেরী তো বাবা আমরা বাপের জন্মেও কাটিনি, ঘোড়ার গাড়ীর কচুয়ান্‌গুলো অম্‌নি করে কাটে।—এই বলিয়া সে তাহার গায়ের ঝাল মিটাইতে আরম্ভ করিল।

দিন কতক পরে অচলা তাহার স্বামীগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিল। নলিনীকান্ত সঙ্গে আসিয়াছিল।

মিনতি তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কুশল প্রশ্নের পর

জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি কথা বল অচি, এ ক'টা দিন তোর কেমন কাট্‌লো ?

বেশ কাট্‌লো, সবার যেমন কাটে। বলিয়া অচলা হাসিতে লাগিল।

মিনতি তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, শুধু তা বল্‌লে তো চলবে না লক্ষ্মীটি, সব বল্‌তে হবে।

অচলা একটুখানি লজ্জিত হইয়া বলিল, সত্যি ভুলে গেছি, আমার কিচ্ছু মনে নেই।

মিনতি বলিল, আমি তা বিশ্বাস কোরব না অচলা, একটি কথাও তুই ভুলিস নি, তা আমি জানি। আর, এতে লজ্জা কর্‌বার তো কিছু দেখিনে অচি,—শ্বশুর শাশুড়ী কেমন ? তাঁরা কি বল্‌লেন ?

শ্বশুর নিজে কিছু না বলিলেও শ্বাশুড়ী বলিতে কিছু বাকী রাখেন নাই। অচলাকে পাল্কী হইতে প্রথমে নামাইবার সময়েই শাশুড়ী-ঠাকুরাণী যেরূপ ভাবে নাক সিট্‌কাইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন হইতেই অচলা বেশ বুঝিয়াছিল যে, ইহার পরিণাম ফল খুব শুভ হইবে না। পরে তাহার চোখের সুমুখে তাহারই রূপের তীব্র সমালোচনা মেয়েদের মুখে-মুখে যখন চলিতে লাগিল, অচলা তখন তুষের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছিল, এবং ইহারই সূত্র ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে শ্বাশুড়ীর বন্ধ-মুখ একেবারেই খুলিয়া গেল। তাঁহার একজন আত্মীয়কে উদ্দেশ করিয়া তিনি কহিলেন,—আমার এমন কার্ত্তিকের মত ছেলের কপাল দেখ মা! এখন ছেলের আমার মনে ধর্‌লে হয়!

সেইদিন ফুলশয্যার রাত্রে ছেলে তাহার মায়ের নিকট আস্ফালন করিতে লাগিল,—বৌ নিয়ে তোমার যা-খুশী তাই কর মা, আমি কালই কল্‌কাতা চলে যাব। কিন্তু এই আমি বলে যাচ্ছি মা, এবার ব্রেহ্ম-টেম্ম যা পাব তাই আমি বিয়ে করে ফেল্‌ব, তখন আর আমায় কেউ দোষ দিতে পাবে না।

মা বলিলেন,—তোর বাবাকে না-হয় জিজ্ঞেস্ করে ছাখ্ নলিন, আমি পাঁচ-শ বার বলেছি, ওগো, মেয়ে দেখে এসো মেয়ে দেখে এসো, কিন্তু উ'নি তখন দেনাশোধের আনন্দে মেতে উঠেছেন, আমার কথাটা একবার ছুঁয়েও গেলেন না। না বাবা বামুনের ছেলে ব্রেহ্মজ্ঞানী বিয়ে কর্‌তে কেন যাবি, আবার তোর বিয়ে দেব, তোর মতই রাঙা টুক্‌টুকে বৌ যদি না আনি ত' আমি—

শ্বশুর, বাহিরের দাবায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, গিন্নি হয়ত, এখনি একটা কঠিন শপথ করিয়া বসিবে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—অত চেঁচাও কেন? কী হয়েছে কী? আজকালকার ছেলেদের ওই হয়েছে একটা ঢং, বৌ পছন্দ হয় না, বৌ পছন্দ হয় না!—আমি যে জেলে যাচ্ছিলুম সেদিকে কারও নজর নেই! আর তুমি ওকে আরও ভাল করে নাচিয়ে দাও, তাহলেই বেশ হবে।

মাতা-পুত্রের এই আলোচনা সম্প্রতি বন্ধ হইল বটে, কিন্তু অচলা তখন পাশের ঘরে বসিয়া বসিয়া ভয়ে ভাবনায় একেবারে কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ আবার মিনতির প্রশ্নে ঠিক্ এই দৃশ্যটাই অচলার চোখের সম্মুখে যেন আর একবার অভিনীত হইয়া গেল।

অচলাকে চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া মিনতি আবার বলিল, আচ্ছা শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা না হয় ছেড়ে দিলুম, জামাইএর সঙ্গে বেশ মনের মিল হয়েছে ত? এবারেও যদি চুপ করে থাক্‌বি অচ্‌লি, তাহলে তোর সঙ্গে আমার জন্মের মত আড়ি,—আর কক্‌খনো তোকে কোনো কথা জিজ্ঞেস কর্‌ব না।

অচলা উপায়ান্তর না দেখিয়া এইবার কথা কহিল। বলিল, এই চার দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে সে একটি কথাও কয়নি।

গত কয়েকদিন ধরিয়া মিনতিও ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল।

কথাটা শুনিয়া সহসা মুখখানা তার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অন্য কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়াই বোধকরি সে বলিয়া ফেলিল, সঙ্গে তো এসেছে ?

—এসেছে কি সাধে ? তার বাবাকে সে বড় ভয় করে, তিনিই ধমক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। হাতটা নাও, সরো তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুই। বলিয়া অচলা তাহার কোলের উপর নিজের মাথাটা গুঁজিয়া দিল।

মিনতি চুপ করিয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, তুই যদি নিজে ছোট হোস্ অচলা, তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য একটু লজ্জা হবে, তা আর কি করবি ভাই,—

এই বলিয়া মিনতি দৃষ্টি অবনত করিয়া অচলার মুখের পানে সস্নেহে তাকাইয়া রহিল।

অচলা তেমনিভাবে মুখ রাখিয়াই কহিল, কি করতে হবে ?

মিনতি একটুখানি ভাবিয়া বলিল, তোকে তার পছন্দ হয়েছে কিনা সেই কথাটাই তাকে জিজ্ঞেস করবি। বলবি, আমায় নাকি তোমার পছন্দ হয়নি ? তাহ'লেই কথা কইবে। তারপর বলিস, আমায় কি করতে হবে ব'লে দাও, কি হলে তোমার পছন্দ হবে।

অচলা বলিল, তা আমি পারব না।

—তবে তোর যা খুশী তাই করিস্, আমি কিচ্ছু জানি নে। বলিয়া অচলার মাথাটা তাহার কোল হইতে নামাইয়া মিনতি বাহির হইয়া গেল।

দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া অচলা বলিল, কে তোমায় জানতে বলছে ? এই বলিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া সে বোধকরি মনে-মনেই ফুলিতে লাগিল।

এককড়ি উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, সম্মুখে মিনতিকে দেখিতে পাইয়া দরজার নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল। যে-কথাটা সে বলিতে

আসিয়াছিল, মিনতির মুখের পানে তাকাইয়া সে যেন তাহা ভুলিয়া গেল। মিনতি বলিল, কি বলচিস্ রে এককড়ি?

এককড়ি বলিল, খেতে দেবে না? আমরা কতক্ষণ থেকে নীচে দাঁড়িয়ে আছি তা জানো?

—আমি কি রোজ তোদের খেতে দিই যে আমায় ডাকতে এসেচিস্?

—দিদির কাছে চাইলুম, সে দিলে না। মানদাও না। বললে উপরে তোদের রাজরাণীর কাছে যা, সে-ই খেতে দেবে।

—বুঝেচি, চল্। বলিয়া মিনতি তাহার হাত ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

কয়েক ধাপ নামিয়াই এককড়ি বলিল, বাঃ! তুমি রাজরাণী,—

নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া নামিতে নামিতে মিনতি বলিল, না রে এককড়ি, আমার কথা কেউ শোনে না। আমি রাজরাণী নই, আমি চাকরাণী।

ছয়

মাস-দুই পরে, একদিন সকালে বাহিরের ঘর হইতে এককড়ি ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বারান্দার উপর অভয়ার ছেলেগুলা ছুটাছুটি মারামারি করিতেছিল, এককড়ি তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, এই! তোরা কে আমার দোয়াত ভেঙেচিস্ বল্, তা নইলে সব এখুনি মেরে খুন ক'রে ফেল্‌ব।

ছেলেগুলো কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না,—আপন মনেই চীৎকার করিতে লাগিল। ঘরের ভিতর হইতে অভয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, মেরে খুন ক'রে ফেলব! আ, কি মিষ্টি কথা রে! ওরা কচি ছেলে, তোর দোয়াতে কোনদিন লেখে? না, ওরা কেউ পাঠশালায় যায়। ওরা তোর দোয়াতের কি জানে? জিজ্ঞেস কর্‌গে গিন্নির সেই ভুস্‌কুমড়ো ভাইটাকে!

মানদা বলিল, সেই তো চব্বিশ ঘণ্টা তোর কাছে থাকে এককড়ি, সেই ভেঙেছে। এরা ইট-পাটকেল নিয়ে খেলা-ধূলো করে, তোর দোয়াত ভাঙতে যাবে কিসের জন্যে?—আয়রে ভোঁদা, পালিয়ে আয়—ও দস্যি ছেলে হয়ত মেরেই বসবে।

ভোঁদা মানদার নিকটে ছুটিয়া পলাইতেছিল, তাহার হাতের দিকে এককড়ির দৃষ্টি পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, এই যে! ভোঁদার হাতে আমার দোয়াতের কালি লেগে রয়েছে, ওই ভেঙেছে। বলিয়া এককড়ি তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, ভোঁদা একদৌড়ে মানদার কাছে গিয়া হাজির হইল। বলিল, শালা!

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মানদা এককড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, কেমন গাল্ দিয়েছে? আর বলবি ওকে?

হ্যাঁ, এই যে গাল দেওয়া বার করছি—বলিয়া এককড়ি ভোঁদার একটা কান ধরিয়া সজোরে মলিয়া দিল।

ভোঁদা কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া আবার বলিয়া উঠিল—হারামজাদা, শালা!

মানদা তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার কানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, ও মা গো, ছেলে একটা দোয়াত ভেঙ্গেছে তার হয়েছে কি? তাই বলে এমনি কস্‌-কস্‌ করে ওর কান মলে দিবি নাকি বুড়ো ধাড়ি?—দে ভোঁদা, তুই আচ্ছা করে গাল দিয়ে দে ওকে—দেখি ও কি করতে পারে।

এই বলিয়া মানদা তাহার কানে-কানে ফিস ফিস করিয়া কি একটা কথা শিখাইয়া দিতেই—ভোঁদা চীৎকার করিয়া এককড়িকে তাহাই শুনাইয়া দিল। কথাটা এমনি বিশ্রী, যে শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। এককড়ি কোনরকমেই সহ্য করিতে পারিল না, ঠাস্‌ করিয়া ভোঁদার মাথায় এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, খবরদার ভোঁদা মাকে বলে তোর গাল দেওয়া বার করব এখুনি, দেখবি মজা?

চড়টা বেশী জোরে না মারলেও ভোঁদা এমন বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল যে অভয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু মানদা তাহার আগেই বলিয়া উঠিল, নে অভয়া তোর ছেলে নে। পরের ঘরে চাকরী কর্‌তে এসে খুনের দায় সামলাতে পারব না বাপু! এমন চড় মেরেছে যে, আর একটু হলেই ছেলে আমার শেষ হয়ে যেতো···

এককড়ি সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল; অভয়া তাড়াতাড়ি একটা বড় কাঁসার ঘটি তুলিয়া লইয়া তাহার মাথার উপর ঠাই করিয়া ঠুকিয়া দিল। উঃ! বলিয়া মাথায় হাত দিয়া এককড়ি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দিদির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বলিবার মত কোনো কথাই সে খুঁজিয়া পাইল না। অভয়া বলিল—

জানি হতভাগা, ওই ডাইনি-মাগীর পরামর্শে তুই আমার ছেলেগুলোকে খুন করবি। আমার ছেলে দেখে ওর হিংসে হয় কিনা, তাই এ হতভাগাকে শিখিয়ে দেয়। আ-মর্! আবার কট্‌মট্ করে তাকাচ্ছে দেখ। দেব আর এক ঘটি বসিয়ে? এত লোকের মরণ হয়, এ ক্ষ্যাপাটা মরে না গো! মায়ের সঙ্গে গেলিনে কেন হতভাগা?

এককড়ির গলার আওয়াজ পাইয়া মিনতি উপর হইতে নামিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে সিঁড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিতেছিল। এইবার তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল, ডাকিল—এককড়ি!

মিনতির ডাক শুনিয়া এককড়ির চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া চোখ দুইটা একবার মুছিয়া লইয়া সে মিনতির কাছে চলিয়া যাইতেছিল, অভয়া তাহার পথরোধ করিয়া মিনতিকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, নিজের ভাইকে শাসন করব তাতে আর যদি কেউ ভালবেশে হাত আড়াল দিতে আসে, তাহলে তারও কিছু বাকী রাখবো না বলে দিচ্ছি। এখানে এসে অবধি অনেক দুষমনী করেছো, এতদিন কিছু বলিনি। কেন, এত কিসের? আমি কি বাপের মেয়ে নই? না, আমার কিছু অধিকার নেই, যে তুই দুদিন এসে কত্তাত্তি মারাচ্ছিস? তুই কে আমার চোদ্দপুরুষের যে তোকে মেনে চলতে হবে?

এই কথাগুলা শুনিয়া মিনতির একবার মনে হইল, তাহার আর দুষমনী করিয়া কাজ নাই, এককড়ি তাহার পেটের ছেলে নয়, এখানে যখন তাহার কোনো দাবী-দাওয়াই চলিতে পারে না, তখনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই ভালো। কিন্তু এই পাগল ছেলেটার অশ্রুপূর্ণ ভয়ার্ত্ত মুখের পানে একবার তাকাতেই মিনতি নিমিষেই অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিল। অভয়ার কথাগুলাকে সে অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং মুখে কোনো কথা না বলিয়াই

এককড়ির একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া, একপ্রকার টানিতে টানিতে তাহাকে সিঁড়ির কাছে লইয়া আসিল।

কাণ্ড দেখিয়া অভয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল, আচ্ছা, এখন আর কিছু বলব না, বাবা আসুক, তারপর দেখি সে কি বলে।

মিনতি বলিল, তাই বলে বিনাদোষে ওকে আমি মার খেতে দেব না।

অভয়া লাফাইয়া উঠিল, মিনি-দোষে ? আনতো মানদা ভোঁদাকে, আমি দেখাই কেমন মিনি-দোষে! ছেলের মাথাটা ফুলে এখনও রক্ত বেরোচ্ছে। এমনি ক'রে না-জানি ও ক্ষ্যাপা হতভাগা কোন্‌দিন ছেলেগুলোকে মেরে ফেলবে।

মিনতি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, বলিল, আমি নিজে সব দেখেছি অভয়া, তোমার ছেলেদের আগে ভাল ক'রে মানুষ কর, নিজেও ভাল হও, তা নইলে ওই ছেলেদের নিয়ে তোমায় কোন্‌দিন চোখের জলে ভাসতে হবে, দেখো।

অভয়া বোধকরি সব কথা গুলা শুনিতে না পাইয়াই তাহার বাবার আগমন প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া রহিল। মানদার কোলে চড়িয়া ভোঁদা তখনও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, মানদা তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া সোহাগ করিতে করিতে অভয়ার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, শুনলি অভয়া, আমি তোর ছেলে মানুষ করি কিনা, তাই আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলা হলো—ছাখ দেখি, ছেলেটা এখনও ফুলছে! না বাবা না, চুপ কর।

অভয়া বলল, বাবা আসুক না, তারপর দেখাচ্ছি কেমন শয়তানী।

মানদা ঠোঁট দুইটা উল্টাইয়া বলিল, তোর বাবাই যদি ভাল হবে তাহ'লে ওর এত বাড় কখনও হয় অভয়া! বলেই বা কি করবি ? গিন্নীকে তো কিছু বলবে না, বুড়ো বয়সে বৌএর পায়ে এখনি হয়ত তেল দিতে ছুটবে।

এমন সময় দরজার কাছে ডাক্-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—অচলা দেবী! একখানা চিঠি আছে।

নদী হইতে এইমাত্র এক ঘড়া জল আনিয়া অচলা রান্নাঘরের টবে ঢালিতে সুরু করিয়াছিল, পিয়নের ডাকে সচকিত হইয়া দরজার দিকে তাকাইল। তাহার নামে চিঠি যে কোথা হইতে আসিতে পারে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিল বলিয়াই বোধকরি মনে-মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেও, ছুটিয়া গিয়া চিঠিখানি লইতে পারিল না, লজ্জায় তাহার পা দুইটা যেন জড়াইয়া যাইতে লাগিল।

অভয়ার বড় ছেলে কালিন্দী অভয়ার উপর রাগ করিয়া মাকে প্রহার করিবার জন্য উঠানের উপর ঢিল সংগ্রহ করিতেছিল। ছেলেটার বয়স সাত-আট বছর,—অতিরিক্ত খাইয়া পেটের অসুখে সে অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মাতার কৃপণতার জন্য কাপড় সে কোনকালেই পরে না, সব সময়ই উলঙ্গ হইয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়। পিয়ন তাহাকেই সম্মুখেই পাইয়া বলিল, এই! অচলাদেবীর চিঠিখানা নিয়ে যাও তো।

কালিন্দী চিঠিখানা পাইয়া নাচিতে নাচিতে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মানদা জিজ্ঞাসা করিল, কার চিঠিরে কালিন্দী?

কালিন্দী বলিল, অচলির।

মা, বাবা এবং মাতামহ ছাড়া সংসারে আর কাহারও সহিত যে কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে, অভয়ার ছেলেগুলি কেহই তাহা জানিত না। কেহ কোনদিন নিষেধ করে নাই বলিয়া সকলের নাম ধরিয়া ডাকা তাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

অচলার চিঠি আসিয়াছে শুনিয়া মানদা চুপি-চুপি বলিল, দে কালিন্দী, আমায় চিঠিখানা দে, পেটের তলায় লুকিয়ে নিয়ে মুখুজ্যেদের ছোট-বৌকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসি—দেখি জামাই কি লিখেছে।

দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া অচলা তাহাদের কথা শুনিতেছিল। মানদার অভিসন্ধি শুনিয়া সত্যই সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল।

অভয়া তখন ঘরের ভিতর বসিয়া একবাটি দুধের সঙ্গে কতকগুলা মুড়ি ভিজাইয়া তাহারই একটা ছেলেকে জোর করিয়া গিলাইয়া দিতেছিল। বর্ণের সহিত অভয়ার পরিচয় কোনদিনই হয় নাই, কাজেই বাহিরের এই আলোচনায় তাহার বিশেষ কোন স্বার্থ ছিল না।

কালিন্দী দুষ্টুমী করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'দেখবি মানদা, চিঠিখানা ছিঁড়ে দু টুক্‌রো ক'রে দেব ?

দুষ্টবুদ্ধিতে মানদাও কম যায় না, বলিল, দে তবে ছিঁড়েই দে।

কালিন্দী সত্যসত্যই চিঠিখানা দুই হাত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে যাইতেছিল। অচলা অন্তরালে দাঁড়াইয়া আর কোন প্রকারেই নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ছোঁ মারিয়া কালিন্দীর হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইল এবং সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়াইয়া দুপ্‌দুপ্‌ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

চিঠিখানা মনের সুখে ছিঁড়িতে না পাইয়া কালিন্দী লাফাইয়া উঠিয়া অশ্রাব্য ভাষায় অচলাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। মানদা অভয়ার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, ওই ছুঁড়ির কাছে থেকে থেকে আমাদের অচলি কেমন বেহায়া হয়েছে দেখেছিস্? ছি, মা! বলি এতটুকু লজ্জা শরম নেই অভয়া, বোন-পোর হাত থেকে চিঠিটা কেমন ছিনিয়ে নিয়ে গেল! না হয় সোয়ামীর চিঠিই হলো—তবু তো বিয়ের এখনও বছর পেরোয় নি। আবার শুনেচিস্ অভয়া, অচলি নাকি ওই ছুঁড়ির কাছে লেখাপড়া শিখছে। জামা তো চব্বিশঘণ্টা গায়ে লেগেই আছে, সাবান মাখছে,—বলি, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ওসব কি লো? মা গো মা! ঘেন্নাও তো করে না?

এই বলিয়া মানদা খানিকটা জিব বাহির করিয়া এবং গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাত

সিঁড়ির উপরেই চিঠিখানি পড়িয়া অচলা ধীরে ধীরে উপরের ঘরের দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার কেমন যেন লজ্জাবোধ করিতেছিল।

এককড়িকে তেল মাখাইয়া দিয়া মিনতি বলিতেছিল, ছোট মামুর সঙ্গে নদীতে স্নান ক'রে এসো। হ্যাঁরে, তুই এতবড় হয়েছিস্ তবু আমি না মাখিয়ে দিলে তোর তেলমাখা হবে না? সবই কি আমায় ক'রে দিতে হবে? কিন্তু খবরদার ব'লে রাখছি এককড়ি, ফের্ যদি ও-ছেলেদের সঙ্গে কথা কইবি তাহ'লে তোর আর কিছু বাকী রাখব না—ছোড়দিকে আর কিছু বলিসনি তো?

এককড়ি বলিল, না।

কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, আচ্ছা, তুমিই বল না মা, এমনি ক'রে মারলে মারা হয়?—এই বলিয়া এককড়ি মিনতির পিঠেব উপর চড় মারিয়া দেখাইয়া দিল।

মিনতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তবে রে দুষ্টু ছেলে! নিশ্চয়ই তুই তাকে আবার মেরেচিস্।

—হ্যাঁ, সে তো একবার! ও আমায় কেন বললে, স্কুলে যা। রবিবারে ইস্কুল বন্ধ থাকে, তা জানে না বুঝি?

—আজ রবিবার তা কেমন ক'রে জানবো বল্। বলিয়া অচলা এইবার ঘরের মেঝের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি বলিল, দিদির সামনে তুই নিজেই নিজের কান মল্ এককড়ি,—বল্, আর কক্‌খনো তোমার গায়ে হাত তুলবো না।

এককড়ির ইচ্ছা ছিল না, তবু নিতান্ত ভয়ে ভয়ে তাহাকে তাহাই

করিতে হইল এবং নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সে পলায়ন করিল এবং কাশীনাথকে ডাকিয়া লইয়া নদীতে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

অচলা বলিল, আমার ওপর ওর এতটুকু মায়া-দয়া নেই, বড় হলে আমায় ও হয়ত বাড়ী থেকে তাড়িয়েই দেবে। আজ বললুম, এককড়ি তুই আমায় যে রকম মার্-ধোর করিস আমি তো আর এখানে থাকতে পারবো না,—হয়, নদীতে ডুবে' মরবো, নয় তো কোনদিকে চ'লে যাব। তাতে সে কি বললে জান? বল্‌লে, যা না তোর যেখানে খুশী, কে তোর পায়ে ধরে সাধছে!

—একটু বড় হলে আর বলবে না। বলিয়া মিনতি অচলার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

অচলা কহিল, হাস্‌চো যে?

—চিঠিতে কি লিখেচে?

অচলা অবাক হইয়া গেল। বলিল, তুমি কেমন করে জানলে, বল!

মিনতি বলিল, বাড়ীর গিন্নির সব দিকে নজর রাখতে হয়।

অচলা ধীরে-ধীরে তাহার কাপড়ের তলা হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া মিনতির কোলের উপর ফেলিয়া দিল।

মিনতি বলিল, একেবারে এত বিশ্বাস?

আমি জানিনে, যাও! বলিয়া অচলা পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মিনতি হাসিতে হাসিতে বলিল, সৎ-মাকে এত বিশ্বাস করতে নেই, শোন্!

অচলা কোন্ কথা শুনিল না,—'জল আনতে হবে' বলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল।

মিনতি চিঠিখানি খুলিল। দেখিল, নলিনীকান্ত কলিকাতা হইতে অচলাকে অনেক কথাই লিখিতেছে। প্রাণেশ্বরী, প্রিয়তমা, প্রণয়,

প্রেম, ইত্যাকার অতি ভক্তির ছড়াছড়ি দেখিয়া মিনতির একটুখানি সন্দেহ হইতেছিল ; অবশেষে তাহার সে সন্দেহ সত্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। চিঠিখানির উপসংহারে শ্রীমান লিখিয়াছেন—

আজ বড় বিপদে পড়িয়া তোমাকে এই চিঠি লিখিতেছি। আমার একটা বড় শক্ত ব্যারাম হইয়াছে—বড় কষ্ট পাইতেছি, এ সময় আমার একশ' টাকার বিশেষ প্রয়োজন। অনেক চেষ্টা করিয়া কোথাও টাকা পাইতেছি না। কাজেই তোমার শরণাপন্ন হইতে হইল। তুমি যদি তোমার একখানি অলঙ্কার আমাকে দিতে পার তাহা হইলে তাহাই বিক্রয় করিয়া আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি নচেৎ বাঁচিব কিনা সন্দেহ। স্বামী যে মেয়েদের কত বড় জিনিষ তাহা বোধহয় তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, আজ তাহারই বিপদের দিনে তোমার একখানা গহনা যদি যায়, তাহা হইলে বিশেষ কিছু যাইবে না। যে-কোন প্রকারে গায়ের একখানি গহনা বিক্রয় করিয়া একশ' টাকা যদি আমার নামে পাঠাইয়া দিতে পার বড় ভাল হয়।

চিঠিতে আরও অনেক কথাই ছিল। মিনতি আদ্যপান্ত সমস্তটুকু পড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার মুখের চেহারাটা কেমন যেন বিবর্ণ মলিন হইয়া উঠিল।

মিনতি ভাবিয়াছিল, অচলা নিশ্চয় পাশের ঘরে বসিয়া আছে। ডাকিল, অচলা!

কোন সাড়া না পাইয়া সে নিজেই ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল। অচলাকে সেখানে দেখিতে পাইল না। মিনতি জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

সেদিন দুপুরে লখুকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মিনতি বলিল, আজ তোমাকে একটি কাজ করতে হবে লখু। তুমি একবার বারুইপুর থেকে ফি'রে আসতে পারবে?

—কেন পারব না মা? কি কাজ আছে, বলুন?

আমার এই বালা-দুগাছি হাতে ছোট হয়েছে লখু, সেখানে কোনও স্যাক্‌রার দোকানে এ-দুটো বিক্রি ক'রে টাকা আন্‌তে হবে। এই বলিয়া মিনতি তাহার আঁচলের খুঁট হইতে একজোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া লখুর হাতে তুলিয়া দিল।

—আর একটা কথা আছে লখু, এ যেন আর-কেউ না শোনে।

লখু কেমন যেন বিহ্বল-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু মা, এই জিনিষ, আমি গরীব লোক, নিয়ে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না তো ?

—এ আর এমন জিনিষ কি লখু ?

—এমনি যে আর-একটা বরাত আছে মা ! বলিয়া লখু তাহার ট্যাঁকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাত দিয়া টিপিয়া সেখানেও এমনি আর একটা বস্তুর অস্তিত্ব দেখাইয়া দিল !

মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, কে দিয়েছে ?

—অচলা দিদি। ঘাটের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি দিয়ে এলো। আমি এত ক'রে বুঝিয়ে বল্‌লুম, এত টাকার জিনিস কি জন্যে বিক্রি কর্‌বে দিদি ? আমি যেতে পারবো না। সে কিছুতেই শুন্‌লে না মা, বললে, তাহ'লে আমার কথা তুমি শুন্‌বে না লখু ? আমি তোমাদের কেউ নই ?—কি কর্‌ব মা ? আমি তাই নিয়ে চল্লুম।

মিনতি বলিল, কথাটা আমায় সে বল্‌তে বারণ করেনি ? তুমি যে বলে ফেল্‌লে ?

—কই না। সেকথা তো বলেনি! তবে কি জানেন্ মা, ওই ছোড়্‌দিটি বড় অভিমানী মেয়ে,—ওই যে প্রথমে যেতে পারবো না বলেছিলুম, তাতেই তার চোখ দুটো জলে ভরে এসেছিল। আর কিছু সে বল্‌তেই পার্‌লে না,—ছুটে পালিয়ে গেল। তবে মনে-মনে ঠিক জানে যে কাজটা যখন লখু-দাকে দিয়েছে, তখন সে তার 'অমান্যি' কোরবে না! আর আপনাকে লুকিয়ে কেউ-যে কোন কাজ করতে পারে বলে তো মনে হয় না, অচলা দিদিই বা লুকোবে কেন ?

—দাও তো দেখি হারটা ? বলিয়া মিনতি হারছড়াটা লখুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া কহিল, তুমি যাও লখু, এ আর তোমায় নিয়ে যেতে হবে না, বালা-জোড়াটার দাম দুশ' টাকার বেশী হবে। কি বল লখু ? যাক্, অচলাকে কিছু বলো না—বারুইপুর থেকে না আসা পর্য্যন্ত তার সঙ্গে দেখাও করো না, যাও—কোথায় গেল সে ? লুকিয়ে লুকিয়ে এসব কি হচ্ছে তার ? বলিয়া মিনতি দরজার দিকে একটুখানি আগাইয়া গেল।

—ওই যে আমার ওপর একটু রাগ হ'লো। সে কি আজ কারো সঙ্গে দেখা কর্‌বে মা ? সারাদিন নদী থেকে হয়ত জলই বইবে।

এই বলিয়া লখু চলিয়া যাইতেছিল, মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, লখু, ওর শ্বশুরবাড়ী তো তুমি জানো,—শ্বশুর বেশ অবস্থাপন্ন, নয় ?

—হ্যাঁ, মা, শ্বশুরবাড়ীও ভাল, জামাইটিও ভাল। আমি আসি মা—যত রাত হো'ক আমি আজই ফিরে আসবো।

যাইবার সময় মিনতি তাহাকে আর-একবার সাবধান করিয়া দিয়া বলিল, নদীর ও-রাস্তাটা ধরে যেও না যেন,—দেখা হলেই হয়ত সে কিছু জিজ্ঞেস্ কোরবে—বাবুকেও কিছু শুনিয়ে কাজ নেই।

—আচ্ছা বেশ।

লখু চলিয়া গেল।

অচলা সত্য-সত্যই সমস্ত দুপুর বেলাটা নদী হইতে ক্রমাগত জল বহিতে লাগিল, অবশেষে বৈকালের দিকে মিনতিকে সঙ্গে লইবার জন্য ডাকিতে আসিল।

মিনতি বলিল, তোর মত একগুঁয়ে মেয়ে আর জীবনে কোন দিন দেখিনি অচলা! কেন আজ তুই এই রোদের সময় জল আন্‌তে গেলি ? মুখখানা কেমন হয়েছে একবার ছাখ্‌না ওই আর্শীতে! একে তো জামাইএর পছন্দ হয়নি, তার ওপর এই চোহারা দেখ্‌লেই হয়েছে।

অচলা লজ্জায়, দুঃখে হাসিয়া ফেলিল।

মিনতি বলিল, জ্যৈষ্ঠি মাসের রোদে বেড়িয়ে তোমার যদি জ্বর হয় অচলা, তাহ'লে বুঝতেই পারবে।

অচলা এইবার যেন কথা খুঁজিয়া পাইল। বলিল, তুমি তবে ডাক্তার কিসের জন্য রয়েছ?

অচলার এই কথাটার মধ্যে শ্লেষ থাকিলেও সত্য ছিল। মিনতির বাবা পোষ্টমাষ্টারী করিতেন এবং একজন ছোট-খাটো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। গরীব-দুঃখীদের বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করিতেন এবং তাহার নিজের ছোট সংসারটিতে বাহিরের ডাক্তার কোনদিন ডাকিতে হইত না। মিনতিকে তিনি হাতে ধরিয়া এ বিদ্যেটা শিখাইয়া গিয়াছিলেন। মিনতি যদি কোনদিন বলিত, আমায় তো ডিস্‌পেন্‌সারী খুলতে হবে না বাবা, আমি তোমার এ-বিদ্যেটা নাই বা শিখলুম। তিনি বলিতেন, বাপরে বাপ! এ যে তোকে শিখতেই হবে মা,—সব মেয়েদেরই যে শেখা উচিত। আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা কত জানিস্? সেই যে সেদিন তোকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলুম···এ যদি তুই না শিখিস্, ছেলে-মেয়েদের জ্বালায় চোখের জলে ভাসতে হবে।

কাজেই মিনতিকে এ-বিদ্যেটা একটু-আধটু আয়ত্ব করিতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাক্স এবং বইগুলিকে সে কোনদিন কাছছাড়া করে নাই। এখনও এই বাক্স খুলিয়া কাহাকেও ঔষধ দিতে গেলেই মিনতির চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসে, গতদিনের অনেক স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে।

আজিও কথাপ্রসঙ্গে সেই কথাটা উঠিয়া পড়িতেই মিনতি জোর করিয়া যেন সে দুঃখের প্রসঙ্গে থামাইয়া দিল। বলিল, চিঠির উত্তর দিবি নে অচলা?

—না! এর আবার উত্তর কি দেব? বলিয়া অচলা মুখ ফিরাইয়া বলিল, এসো, যাবে কখন্?

মিনতি মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, একেবারে টাকা পাঠিয়ে দিবি। কেমন?

অচলা বুঝিতে পারিল না, রাগ করিয়া বলিল, আমি জানিনে। চিঠিখানা পড়েছ তো? তবে দাও আমার চিঠি। বলিয়া অচলা হাত পাতিল।

—ভারি তো তোর চিঠি! আমায় দিয়ে বিশ্বাস হচ্ছে না! এই নে। বলিয়া মিনতি আলমারি হইতে চিঠিখানি আনিয়া তাহার হাতে ফেলিয়া দিল।

এমন সময় লখু আসিয়া দাঁড়াইতে অচলা শশব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। দুইজনকে একসঙ্গে দেখিয়া লখুও বিশেষ বিপদে পড়িয়াছিল। মিনতি গোপনে হাসি চাপিয়া বলিল, তুমি এরই মধ্যে ফিরে এলে লখু?

—হ্যাঁ মা, গেলুম আর এলুম। এ আর কতটুকু রাস্তা। বলিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অচলা দরজার নিকট বিপরীতমুখে দাঁড়াইয়া রাগে অভিমানে লখুর উপর মনে মনে ফুলিতেছিল।

মিনতি বলিল, লজ্জা ক'রে আর কি হবে অচলা,—দাও লখু, কত হলো দাওনা ওর হাতে।

লখু এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার চাদরের খুঁট হইতে টাকা ও নোটে সর্ব্বসমেত একশো পঞ্চান্নটি টাকা এবং স্যাক্‌রার হাতের লেখা একটি হিসাবের কাগজ বাহির করিয়া মেঝের উপর নামাইয়া দিল। তাহার পর অচলার দিকে ফিরিয়া বলিল, এইবার গুণে নাও ছোড়দি এই কাগজে হিসেবটাও লেখা আছে।

হিসাবের কাগজটা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া মিনতি বলিল, তুমি এবার যাও লখু, আমরা সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

লখু চলিয়া গেলে মিনতি অচলার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

নাও আর অভিমানে কাজ নেই, টাকাগুলো তুলে রাখ। কেউ দেখবে এক্ষুনি।

অচলা কোন কথা না বলিয়া টাকাগুলা আলমারির ভিতর তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই মিনতি বলিল, আমি জানতে পেরেছি ব'লে রাগ হচ্ছে তোর ?

অচলা বলিল, না, রাগ কেন হবে ?

—এবার কি করবি ?

—তা জানি নে।

মিনতি বলিল, একখানা চিঠি লিখে দে, সে এসে টাকা নিয়ে যাক্। অসুখ যদি হয়েই থাকে সেখানেও তো একলাটি পড়ে থাকা ভাল নয় !

অচলা হেঁটমুখে বলিল, অসুখ যদি বেশী হয় ? যদি আসতে না পারে ?

—টাকা তখন পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। তোর ভাবনা কি অচি, পোষ্টমাষ্টারের মেয়ে টেলিগ্রাম মণি-অর্ডার করতেও জানে।

অচলা এবার হাসিয়া ফেলিল।

মিনতি বলিল, আচ্ছা কেউ যদি তোকে জিজ্ঞেস করে অচিন হারগাছাটা কোথায় গেল,—কি বলবি তখন ?

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

মিনতি আবার বলিল, চুপ ক'রে রইলি যে ? বল্।

—বলব, হারিয়ে গেছে।

মিনতি বলিল, এই বুঝি তোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হচ্ছে ? এই না সেদিন আমার কাছে শপথ ক'রে বললি, মিছে কথা জীবনে আর কোনদিন বলব না !

ইহার উত্তরে অচলা কিছুই বলিতে পারিল না। মিনতির মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল মাত্র।

—না না, মিছে কথা কারো কাছে কোনদিন বলতে পারিনে অচলা! এ আমার বাবার উপদেশ,—তিনি আমার হাত ধ'রে শিখিয়ে গিয়েছিলেন।—চল্ এবার যাই আমরা, সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অচলা বলিল, তবে কি বলব?

—আমায় না জানিয়ে এ কাজ করলি কেন? আমি কিচ্ছু জানি নে, এইবার শাস্তি পাও। বলিয়া অচলার হাত ধরিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় মিনতির পরামর্শমত অচলা তাহার স্বামীকে চিঠি লিখিয়া মিনতিকে বলিল, এইবার ঠিকানাটা তোমাকে লিখে দিতে হবে।

মিনতি বলিল, এত ক'রে লিখতে পড়তে শেখালুম, এখনও যদি আমায় ঠিকানা লিখে দিতে হয়······না, আমি পারব না। আমি অন্য একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি, দেখে দেখে লিখতে হবে।

—বোধহয় ঠিক পারব না। বলিয়া অচলা মিনতির লেখা কাগজখানা লইয়া লিখিতে বসিল।

লেখা শেষ হইলে মিনতি বলিল, এই তো বেশ হলো।

কলমটা নামাইয়া দিয়া অচলা হাসিয়া বলিল, বাবাঃ! এ এক দায়!

মিনতি খুশী হইয়া বলিল, আচ্ছা এই নে, আর একটা দায় থেকে তোকে আমি উদ্ধার করলুম।

এই বলিয়া মিনতি তাহার নেক্‌লেস্‌টি তাহারই গলায় ধীরে ধীরে পরাইয়া দিল।

অচলা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

মিনতি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, আমার গেলে আবার হবে, কিন্তু তুই পাবি কোথায় অচলা?

তোর বাবা কি আর দেবে? দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করলে বাপ যে পর হয়ে যায় অচি, সে কি আর তোদের আপনার আছে ভেবেচিস্?

এমন সময় হুঁকা এবং চটিজুতার শব্দে উভয়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রাসবিহারী ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

অচলা শশব্যস্ত হইয়া চিঠিখানা লুকাইয়া ফেলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, মিনতি তাহার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া সজোরে একটা টান মারিতেই অচলা পুনরায় বসিয়া পড়িল।

ষাট

বহুদিন হইতে হিতলাল ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছিল। কিন্তু জ্বরই হউক আর যাহাই হউক, খাইবার লোভ সে কোন প্রকারেই সম্বরণ করিতে পারিত না। কেহ নিষেধ করিলে বলিত, তোমরা জানো না বাপু, আহার শরীরের ধর্ম্ম, না খাইলে শরীর থাকে না। কাজেই রোগ তাহার সারিতে চাহিতেছিল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। জ্বর-জ্বালা হইলেই হিতলালের জঠরানল হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তখন আর সে তাহার চাক্‌রীস্থানে কোনরূপেই টিঁকিতে পারিত না, অভয়ার কাছে পলাইয়া আসিয়া প্রাণপণে শরীরধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রচণ্ড বিক্রমে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত। কিন্তু একসঙ্গে দুইটা দিক রক্ষা করা বড় কঠিন। এমনি করিয়া শরীর রক্ষা করিতে গিয়া একদিন তাহার চাক্‌রীটি গেল। তা যাক্। হিতলালের তাহাতে বিশেষ কিছুই আপত্তি ছিল না। শাল-গ্রামের শোওয়া-বসা দুইই সমান। চাকরী করিয়া যে-কয়টা টাকা সে মাহিনা পাইত তার চেয়ে অনেক বেশী টাকার আহার্য্য সে শ্বশুর-বাড়তে থাকিয়া উদরস্থ করিতে পারিবে।

কিন্তু হিতলালের জ্বর ক্রমে পুরাতন হইয়া এখন দুই তিন দিন অন্তর ঠিক নিয়মিতভাবেই দেখা দিতে লাগিল। সেদিন বৈকালে তাহার জ্বর আসিবার পালা। দুপুরে সে রীতিমত আহার করিয়া এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়াই অভয়াকে বলিল, দে, আর খানিকটা দুধ আছে তো দে, খাই।

অভয়া তাহাকে রান্নাঘরের অন্ধকার কোণের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া উনানে-চড়ানো কড়াই হইতে একবাটি দুধ তাহার হাতের কাছে

ধরিয়া দিল। হিতলাল খাইতে যাইবে, এমন সময় অভয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া সজোরে সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করিয়া ডাকিল, এই।

হিতলাল হাতের বাটিটা পুনরায় মাটিতে নামাইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কি?

হাতে কল্‌কে ধরিয়া যেমন করিয়া তামাক খায়, তেমনিভাবে অভয়া তাহার দুই করতল একত্রিত করিয়া নিজের মুখের নিকট লইয়া গিয়া বলিল, আবার সেই খেয়ে এলে নাকি? চোখদুটো যে লাল হয়ে রয়েছে?

ইসারায় বুঝাইয়া দিলেও হিতলাল তাহা বুঝিতে পারিল, বলিল, মাইরি বলছি, এই দুধের বাটি ছুঁয়ে বলছি খাইনি।

দুধের বাটি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল বটে, কিন্তু তাহার এই মিথ্যা অভিনয়-চাতুর্য্যে সে যে আজ তাহার বিদুষী ভার্য্যাকেও হার মানাইয়াছে, এই আনন্দে হিতলাল মনে-মনে একটুখানি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। ইহা তাহার বহুদিনের অভ্যাস। দিনান্তে দুই তিনবার সে-বস্তুটি না খাইলে সে যে থাকিতে পারে না, ইহা কি তাহার দোষ? সে আজ অনেকদিনের কথা। নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হিতলালের বয়স তখন পনেরো কি ষোলো। নিজ উদরান্নের সংস্থান করিতে গিয়া দেখিল, একে কালা, তাহার উপর বিদ্যার দৌড় তাহাদের গ্রামের ইস্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত। কাজেই একমাত্র পরের বাড়ীর ভাত রাঁধিয়া ভাত খাওয়া ছাড়া আর কোন পথই সে ঠাহর করিতে পারে না। কৌলিন্যের গর্ব্ব যেটুকু আছে, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতার নিকট ছাড়া সে অমূল্য রজত কাঞ্চনটি ভাঙাইতে গেলে অন্যের কাছে দস্তার দরে বিকাইয়া যায়, কি করিবে, হিতলাল অনেক ভাবিয়া কূল-কিনারাই পাইল না। অবশেষে এক উপায় মিলিল। তাহাদের গ্রামের কয়েকজন ছোক্‌রা পশ্চিমের কোন্ একটা

শহরে পচা ময়দার পাঁউরুটি-বিস্কুট বেচিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। হিতলাল ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া তাহাদের সহিত চলিয়া যাইবে। রমণ অধিকারী তাহাদের পাণ্ডা। মস্ত লম্বা-চওড়া জোয়ান। কিন্তু যেমন মাতাল, তেমনি গাঁজাল। সে-ই একদিন বলিল, দূর শালা কালা-হাতী, গাঁজা না টানলে কষ্ট সইবি কেমন ক'রে? খা।

সেই অবধি হিতলাল গাঁজা ধরিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিস্কুট কিংবা রুটি কিছুই বেচিতে হইল না। একদিন সে রাসবিহারীর নজরে পড়িয়া গেল। অভয়াকে লইয়া তিনি তখন বড় বিপদেই পড়িয়াছিলেন। কুরূপ কুৎসিত এই মেয়েটাকে কেহই গ্রহণ করিতেছিল না। এমন সময় কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানটিকে তিনি ঘরে লইয়া আসিলেন এবং সস্তাদরে তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিজের জাতি, কুল এবং মান সমস্তই একসঙ্গে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সে কথা যাক্।

দুধের বাটিটা ঢক্‌ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসেই শেষ করিয়া দিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে হিতলাল তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিতেছিল, অভয়া তাহার হাতখানা টানিয়া ধরিয়া বলিল, আর বেরিয়ে যেয়ো না, বসো।

প্রত্যুত্তরে ঘাড় নাড়িয়া হিতলাল কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই ভক্ করিয়া সে খানিকটা বমি করিয়া ফেলিল। কোনরকমে নাক-কান বুজিয়া বাহিরে আসিয়া সে ভাল করিয়া বমি করিতে বসিল। শরীর এবং প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এতক্ষণ ধরিয়া যেসব মূল্যবান আহার্য্যগুলিকে সে প্রাণপণে পেটের ভিতর ঠেলিয়া দিতেছিল, তাহারা সকলেই বাহির হইয়া গেল। হিতলালের আর আপ্‌শোষের সীমা রহিল না।

—কই দেখি? বলিয়া প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার দিয়া অভয়া হিত-

লালের গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, জ্বর এসেছে তো পিণ্ডি গিল্‌তে গেলে কেন? ক্ষীরের মত অতটা দুধ ছেলেগুলো খেয়ে বাঁচতো।

হিতলাল বলিয়া উঠিল, হ্যাঁঃ পিণ্ডি! না খেলে মানুষ কখনও বাঁচে! কই, থাক্ দেখি দুদিন না খেয়ে? তিন দিনের দিন—পটল!

একে বমি করিয়া জলের অভাবে মুখখানা তাহার খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর যেরকম মুখভঙ্গি করিয়া কথাগুলি সে উচ্চারণ করিল, তাহা দেখিয়া অভয়াও তাহার হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। একঘটি জল আনিয়া হিতলালের হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, লেপ চাপা দিয়ে শোওগে যাও।

হিতলাল সহসা দরজার দিকে তাকাইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, ওই ছ্যাখ্, কে এলো! সেই বাঁদরটা,—

অভয়া তাকাইয়া দেখিল, তাহাদের ছোট জামাই নলিনীকান্ত আসিতেছে। মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া দিয়া বলিল, এসো।

ভোঁদাকে কোলে লইয়া মানদা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছোট জামাইবাবু যে! এসো, এসো!—এই বলিয়া রান্নাঘরের বারান্দার মেঝের উপরেই একটা চৌকি পাতিয়া দিয়া বলিল, বসো, হাত-পা ধোও। কোল থেকে একবারটি নাম্ ভোঁদা, জামাইবাবুর জন্যে আমি চা' করি।

নলিনীকান্ত হাত হইতে চাম্‌ড়ার ব্যাগটা নামাইয়া ভদ্রতার খাতিরে হিতলালকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ভাল আছেন? একি? বমি করলেন কেন?

মাত্র 'বমি' কথাটা হিতলাল শুনিতে পাইয়াছিল। বলিল না শুধু দুধ নয়, ভাত-টাত সব উঠে গেল। মেলোয়ারী জ্বরের মতন পাজী জ্বর আর কি আছে?—বাড়ীর সব মঙ্গল তো?

নলিনীকান্ত বলিল, হ্যাঁ।

মানদার হাতে চায়ের কেট্‌লি দেখিয়া হিতলাল চীৎকার করিয়া বলিল,গরম চা আমাকেও একটু দিস্‌ মানদি, আমি শুইগে।

এই বলিয়া সে জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

ভোঁদাকে নলিনীকান্তের কাছে নামাইয়া দিয়া মানদা চায়ের জল গরম করিতে গিয়াছিল। ভোঁদা চুপ করিয়া দাঁড়াবার ছেলে নয়। তবে এতক্ষণ এই নবাগত অতিথিটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জা,—বিশেষতঃ তাহার হাতের ওই চক্‌চকে ঘড়িটার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই দেয়ালের একপাশে দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাহার প্রলুব্ধ দৃষ্টি হানিতেছিল। এইবার অসহ্য হইয়া উঠিল। এদিক-ওদিক বার দুই তাকাইয়া মানদার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বায়না ধরিবার সে উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিন্দীর উপর তাহার নজর পড়িল।

কালিন্দী তখন তাহার আরও দুইটা ভাইকে সঙ্গে লইয়া উঠানের একপাশে ধানের একটা গোলার আড়ালে গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল। ইচ্ছা ছিল, বর্ষার জল ধরিয়া সেইখানে একটা পুষ্করিণী প্রস্তুত করিবে,—সেখানে ছোট ছোট পুঁটি মাছ থাকিবে, দিবারাত্র ব্যাং ডাকিবে, আরও কত-কি হইবে। ছুটিয়া গিয়া ভোঁদা তাহার কাছে এই শুভ সংবাদটি ঘোষণা করিয়া দিল। প্রকাশ্য দিনের আলোয় এতবড় একটা ঘটনা সাধারণত কালিন্দীর চোখ কোনদিনই এড়াইতে পারে না। কথাটা শুনিবামাত্র—'ওরে জামাইরে!' বলিয়া একদৌড়ে রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া সে দম লইল। অদূরেই নলিনীকান্ত বসিয়াছিল। দেখিতে-না দেখিতে একেবারে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কালিন্দী নলিনীর জামার হাতায় সজোরে একটা টান্‌ দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, জামায়ের বোতাম দেখে যা ভূতো! ওরে, সোনার রে!

নলিনীকান্ত অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিল। হাত ধরিয়া এই

দিগম্বর বালকটীকে অতি কষ্টে সরাইয়া দিয়া বলিল, এমন করে না, ছি! চুপ ক'রে বসো। না হয় খেলা করগে, যাও।

কালিন্দী মুখ ভেঙাইয়া বলিল, হ্যাঁ যাবে? তোর কথাতেই যাবে।

আর একটা ছেলে সাহস পাইয়া বলিয়া উঠিল, যাবে। তোর বাবার বাড়ী এটা?

ছেলেগুলাকে উত্তমরূপে ঘা-কতক দিবার জন্য নলিনীকান্তর হাত দুইটা নিশ্‌পিশ্‌ করিতেছিল, কিন্তু মানদার জন্যে তাহাও পারিল না।

একটা ছেলে দেয়াল ধরিয়া তাহার ব্যাগের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহাকে ধীরে-ধীরে নামাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, নামো, এখানে দাঁড়াতে হয় না।

এদিক হইতে কালিন্দী, জামাইএর ঘড়ি-বাঁধা হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এইটি দে, তবে নাম্‌বে।—নামিসনি রে গোবিন্দ!

তাহার ধুলি-কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদের দুরবস্থা দেখিয়া এই ছেলেটির উপর রাগে নলিনীকান্তের আপাদ-মস্তক জ্বলিতেছিল, এইবার তাহার একটা কান মলিয়া দিয়া বলিল, যা এখান থেকে।

এমন সময় কাঁসার একটা গ্লাস-ভর্ত্তি চা এবং একটা বাটি নামাইয়া দিয়া মানদা বলিল, নাও জামাই, চা খাও। এতদিন আসনি যে? সেই কবে গিয়েছ তার ঠিক্ নেই! সেদিন তোমার চিঠি এলো,—অচ্‌লিকে অত করে বললাম, জামাই কি লিখেছে বল্, কবে আস্‌বে বল্, তা না ছুঁড়ি লজ্জাতেই অস্থির!

উপায় নাই দেখিয়া, নলিনীকান্ত সেই আগুনের মত তপ্ত কাঁসার গ্লাস হইতে ততোধিক উত্তপ্ত খানিকটা কালো-রঙের চা ঢালিয়া গরম বাটিটা অতি কষ্টে মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

এই অপরূপ পদার্থটি পান করিবার জন্য ছেলেগুলা ইহারই মধ্যে মানদার অষ্টে-পৃষ্ঠে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। কালিন্দী কিন্তু ইহাদের

হট্টগোলে যোগ না দিয়া জামাইয়ের কানমলা খাইয়া নিতান্ত নিরীহের মত একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সুযোগ বুঝিয়া নলিনীর হাতের বাটিটার নীচে একটা ধাক্কা দিয়া, সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, হেঁ—চ্চো! কেমন মজা!

বাটিটা তাহার হাত হইতে ঠিক্‌রাইয়া হাত দশ-বারো দূরে গিয়া পড়িল। নলিনীকান্তর সর্ব্বাঙ্গ গরম চা পড়িয়া গায়ের চামড়া পর্য্যন্ত পুড়িয়া গেল। জামা-কাপড় ইত্যাদির যে দুর্দ্দশা হইল, তাহা আর বলিবার নয়। উঠিয়া সে তাহাকে একবার ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কালিন্দী তখন ছুটিয়া উঠান পার হইয়া গেছে এবং বাহিরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দন্ত-বিকাশ করিতেছে।

কাণ্ড দেখিয়া মানদা বলিল, ঠাট্টা-তামাসা আমরা কর্‌ব,—তোদের যে মেশো-মশায় হয় রে হতভাগা! ওমা! একি! সব চা-টুকু প'ড়ে গেল নাকি? দাঁড়াও ভাই, আর একটু এনে দি, খাও।

এই বলিয়া চায়ের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া মানদা চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু চা খাইবার ইচ্ছা তাহার আর ছিল না। আজ সে বিপদে পড়িয়াই এখানে আসিয়াছে, তাহা না হইলে এতক্ষণ সে পুনরায় ষ্টেশনে ফিরিয়া গিয়া কলিকাতার ট্রেনে চড়িয়া বসিত। বলিল না, চা আর আমি খাব না।

জামাই হয়ত রাগ করিয়াছে ভাবিয়া মানদা চীৎকার করিয়া ডাকিল, অভয়া, দেখে যা তোর ছেলের কাণ্ড! জামাইএর সঙ্গে কেমন করেছে দেখে যা। দাঁড়াও ভাই, চা আমি এনে দিচ্ছি।

অভয়া হিতলালের সঙ্গে সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল, মানদার ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিল। নলিনীকান্তের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, এ কি হয়েছে হে! গায়ে জল ফেলে দিয়েছে নাকি?

মানদা বলিল, জল কেন হবে অভয়া, গরম চা। তা তুই যা-ই

বল্ অভয়া, তোর কালিন্দীটা বড় বজ্জাৎ। এই ত' আমার ভোঁদাও দাঁড়িয়ে আছে সে ত কিছু করে নি?

অভয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ছোট ছেলে, জামাইকে সবাই ঠাট্টা-তামাসা করে, ভেবেছে বুঝি তাহাদের ও তামাসার সম্বন্ধ। নাও ভাই, তুমি ও-গুলো খুলে ফেলো, আমি কেচে দেব।

ইহাদের হাঁক-ডাকে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কাশীনাথ ও এক-কড়িকে লইয়া মিনতি নীচে নামিয়া আসিল। এতক্ষণ ধরিয়া এই জামাইটিকে লইয়া বাড়ীর নীচে যে-সব কাণ্ড ঘটিতেছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

মিনতি বলিল, ভালো আছ ত নলিনী? কলকাতা থেকে আস্চো?

নলিনীকান্ত মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

মিনতি তাহার ব্যাগটা কাশীনাথের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, জামাই বাবুকে নিয়ে তোমরা উপরে বসো গিয়ে, আমি যাচ্ছি।— এককড়ি। শোনতো বাবা!

নলিনীকান্ত ও কাশীনাথ উপরে উঠিয়া গেল। এককড়িকে কাছে টানিয়া আনিয়া মিনতি ধীরে-ধীরে কহিল, তুমি যাও তো বাবা কাছারিতে,—তোমার বাবাকে বলগে, জামাইবাবু এসেছেন। আর পারিস্ তো অম্নি লখুকেও ডেকে আনিস্, বুঝলি?

এককড়ি চলিয়া গেলে মিনতি বলিল, তোমাদের চায়ের কাপ্-ডিস্ কি হলো মানদা? এই গ্লাসে ক'রে কি নলিনীকে চা দেওয়া হয়েছিল নাকি?

মানদা বলিল, তা আমি কি কর্‌ব মা, ভাঁড়ারের চাবি ছিল অভয়ার কাছে। হাতের কাছে যা পেলুম, তাতেই দিয়েছি, তোমার ক্যাপ্-ট্যাপ্ কোথায় কিন্‌তে যাব বল?

অভয়া তো কোনো দূর দেশে যায়নি মানদা? চেয়ে আন্‌লেই

তো পারতে? আর এই কি চায়ের রং হয়েছে? ছি! ছি! দাও চারটি ময়দা মেখে দাও, খানকতক্ লুচি আমি ভেজে দিচ্ছি। যাও আর দেরী করো না, ওঠ।

মানদা তাহার মুখের উপর কিছু বলিতে পারিল না। অভয়ার কাছে ভাঁড়ারের চাবি আনতে গিয়া বলিল, গিন্নি যে আজ নিজেই কোমর বেঁধে লেগেছে অভয়া, বলি, ব্যাপার কি? আমি আজ আর কোনো কাজেই হাত দিচ্ছিনে অভয়া, আমার মাথা ধরেছে। তুই ঘি-ময়দা বের ক'রে দিগে যা।

ভাঁড়ারের চাবিটা খুঁট হইতে খুলিয়া, অভয়া তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, জামাই-সোহাগী ওই শাশুড়ী-ছুঁড়িকে বল্, —আমি পার্‌বো না।

মানদা তাহার আরো কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, না অভয়া, তুই আর চোরের উপর অভিমান ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাস্ নে,—ভাঁড়ারের চাবি ছাড়িস্ নে, ছাড়িস্ নে। খানিক বেশী ক'রে বরং বের করে দিগে, নিজের ছেলেগুলোও দু'-একখান ক'রে পাবে। তা নইলে, ছেলের নামে পোয়াতি বাঁচবে। জামাইএর নাম ক'রে ওর ওই ভাইটাকেই পিণ্ডি সব গেলাবে।

এত বড় একটা অভ্রান্ত সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে অভয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে দেখিয়া হিতলাল নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না। লেপের তলা হইতে তাহার মাথাটা ধীরে-ধীরে উঁচু হইয়া উঠিল এবং দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সে বলিতে লাগিল, তুই বুঝিসনে কেন মাগী, যা না!

পরক্ষণেই জ্বরের তাড়নায় তাহার গলার আওয়াজ একটুখানি নরম হইয়া আসিল। বলিল, অম্‌নি গোটাকতক আলুও ভেজে নিস্, বুঝলি? জ্বর আমার ছেড়ে এলো ব'লে।

নয়

মিনতির কথা শুনিয়া অচলা চিঠি লিখিয়াছিল। কিন্তু সে কোনো প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, নলিনীকান্ত তাহার চিঠি পাইবামাত্র এমন সশরীরে আসিয়া হাজির হইবে।

মিনতি বলিল, দেখেচিস্ অচলা, আমি জানি, নলিনীর অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি। কলকাতায় থাকে, বাপের কাছ থেকে বেশী টাকাকড়িও পায় না, তার উপর আজকালকার ছেলেরা একটু সৌখিন। কিছু টাকার দরকার হয়েছিল তাই, লিখেছিল।

—তা হবে। বলিয়া অচলা চুপ করিয়া রহিল।

মিনতি তাহাকে সাবধান করিয়া দিল, তার চিঠির কথা যে আমিও জানি, সেটা যেন সে ঘুণাক্ষরেও বুঝ্‌তে না পারে অচি। তাহ'লে হয়ত' তার লজ্জার অবধি থাকবে না। তার উপর রাগ কোরতেও পারে।

কিন্তু নিজের অসুখের ছলে স্ত্রীর গহনা বেচিয়া সখ করিয়া টাকা উড়াইতে যে শিক্ষিত স্বামী লজ্জা বোধ করে না, তাহাকে লজ্জা দিবার মত আর কোনও বস্তু যে থাকিতে পারে মিনতির তাহা জানা ছিল না। তাই সে বড় দুঃখে মনে মনে একটুখানি হাসিয়াই চুপ করিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া মিনতি আবার বলিল, এখন দিন-কতক তাকে যেতে দিস্‌নে।

অচলা বলিল, আমার কথা সে শুন্‌লে ত? পড়ার ক্ষতি হবে।
প্রত্যুত্তরে মিনতি শুধু একটুখানি হাসিল।

—হাস্‌চো যে?

—তোর কথা শুনে হাস্‌ছি। এর মধ্যে সে কথাও ভেবে রেখেছিস্‌ বুঝি? না রে না, শুন্‌বে। তোর সে-ভয় নেই। টাকা দিতে একটু দেরী করিস্‌ তা হলেই শুন্‌বে। আর, পড়ার ক্ষতি হবে না,—ওর মত ছেলেরাই পরীক্ষায় ফেল করে, তা আমি জানি।

—যাও! বলিয়া একবার মুখ টিপিয়া হাসিয়া অচলা সেখান হইতে পলায়ন করিতেছিল। মিনতি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। বলিল, এই তরকারিটা নামিয়েই ওদের আমি খেতে দেব। একটু বোস্‌ না অচি, রান্না ঘরে আমায় একা ফেলে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না?

অচলা বলিল, নাও বসলুম, কি বলবে বলো।

মিনতি বলিল, কি আর বোল্‌বো! এতদিন ধ'রে তোকে যা বলেছি, সব যদি তোর মনে থাকে, তাহ'লে আর কিছুই বলবার দরকার নেই।—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে? লখু?

এককড়ি বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, আমি বুঝি লখু?

মিনতি হাসিয়া বলিল, আয়। পড়া হয়ে গেল? মাষ্টারমশাই চলে গেছেন?

হ্যাঁ, আজ যে তুমি রাঁধছো? বলিয়া এককড়ি তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিনতি বলিল, আজ থেকে তোদের আমি রাঁধুনী হলুম, কত টাকা মাইনে দিবি বল।

এককড়ি বলিল, দুশো—তিনশো টাকা।

—তাহ'লে এই রাঁধুনীর মাইনে জোগাতেই তোর বাবাকে ফতুর হতে হবে। আচ্ছা যাও তো বাবা, জামাইবাবুকে আর ছোট মামুকে ওপর থেকে ডেকে নিয়ে এসো—তোমাদের খেতে দিই।

এককড়ি অচলার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ছোড়দি, তুই এমনি রাঁধতে জানিস?

অচলা বলিল, ওর চেয়ে ভাল জানি। আমাকে তিন-শ টাকা মাইনে দিস্ যদি তাহালে কাল থেকে আমিই রাঁধি।

মিনতি গম্ভীরভাবে এককড়ির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আমার কথা শোনা হলো না বুঝি? গেলি নে যে?

এককড়ি কোন উত্তর দিল না। অচলার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুই ছাই জানিস্, তোর মাইনে তিন পয়সা। এই বলিয়া এককড়ি একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি একটা কথা বলিল।

কথাটা শুনিয়া অচলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তা আমি পারবো না ভাই, মা বক্‌বে।

অচলার পিঠের উপর একটা চিমটি কাটিয়া দিয়া এককড়ি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। যাইবার সময় চেঁচাইয়া বলিয়া গেল, না পারলি তো আমার ভারি বয়েই গেল, অন্ধকারে আমি কখখনো ভয় করি না, তা জানিস্।

অচলা উঃ! করিয়া উঠিতেই, মিনতি বলিল, কি হলো রে অচি? —দেখলে না, কি হলো? আমার কানে-কানে বল্‌লে অন্ধকারে আমার ভয় পাবে, সিঁড়ির-দোর পর্য্যন্ত আমায় একটু দাঁড়িয়ে দেবে এসো। আমি গেলুম না, তাই একটা চিম্‌টি কেটে দিয়ে ছুট্‌লো।

মিনতি ঈষৎ হাসিল। বলিল, ছোট ছেলে-মেয়েদের অন্ধকারে জুজুর ভয় দেখান বড় খারাপ। তাদের সেই ধারণা বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত থেকে যায়। তোর যখন ছেলে-মেয়ে হবে অচি, আমি যদি ততদিন বাঁচি, আমায় দিস্, আমি মানুষ করে দেব। আমার বড় সাধ ছিল—।

কথাটা শেষ করিতে পারিল না। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এইখানে ওদের ঠাঁই করে দে অচলা, আমি খাবার সাজিয়ে নি। তোর বাবা তো এখন দাবায় মেতেছে, এরপর খাবে।

অচলা ঠাঁই করিবার জন্য উঠিল বটে, কিন্তু যে-কথাটা বলিতে গিয়া মিনতি থামিয়া গেল, অচলা তাহা টের পাইয়াছিল। জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া আসন পাতিয়া জল দিতে গিয়া বলিল, তুমি তো বুড়ো হও নি, সে সাধ তোমার—

মিনতি কথাটা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, জামাই আস্‌চে, বেশী চেঁচাসনে অচলি, চুপ কর।

সিঁড়ির উপর জুতাব শব্দ হইতেই অচলা সরিয়া গেল।

তাহারা খাইতে বসিলে ভোঁদাকে কোলে লইয়া মানদা একবার তত্ত্বাবধান করিতে আসিল। নলিনীকান্তর কাছে গিয়া বলিল, লজ্জা করো না জামাই, সবগুলি খেতে হবে, পারত বরং আরও দিচ্ছি। —যারে ভোঁদা, মেসোর সঙ্গে বসে বসে খেগে যা। দাও তো ভাই একে খাইয়ে।

তাহারা সন্ধ্যার পরেই ভাত খাইয়া ঘুমাইতেছিল। লুচি খাওয়াই-বার জন্য মানদা তাহাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছে। সদ্য নিদ্রোত্থিত ভোঁদাকে মানদা অনেক টানা-হেঁচড়া করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন-প্রকারেই যখন তাহাকে কোল হইতে নামাইতে পারিল না তখন সে তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল ময়েন্‌-দেওয়া ফুল্‌কো ফুল্‌কো লুচি,—এমনি বড় বড় মাছের মুড়ো,—রসগোল্লা,—ছানাবড়া, —মিহিদানা,—একবার নেমেই ছাখ না ভোঁদা, কাল সকালে কাঁদলে কিন্তু পাবি না।

এতগুলা মুখ-রোচক পদার্থের নাম শুনিয়া ভোঁদার ঘুম ছাড়িয়া গেল এবং কোল হইতে অবতরণ করিয়াই সে বায়না ধরিয়া বসিল যে, মাটীতে সে কোন প্রকারেই বসিতে পারিবে না, আসনের উপর উপবেশন করিয়া আহার করিবে।

মানদা বলিল, তাই দাও না জামাই, তোমার আসনটা একটু ছেড়ে। ডান দিকে ওই একটু সরে বস্‌লেই হবে।

এই বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই নলিনীকান্তের আসনের একপাশে ভোঁদাকে বসাইয়া দিয়া মানদা একটা থালা লইয়া মিনতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, দাও তো মা, তোমার বড় জামাইকে একথালা সাজিয়ে। হিতলাল আজ সারাদিন কিছু মুখেও দেয়নি। লুচি খানকতক বেশী করেই দিও। কালিন্দী-টালিন্দী ছেলেগুলো উঠে পড়বে, ওকে আর খেতেই দেবে না।

মিনতি থালা সাজাইতে যাইবে এমন সময় নলিনীকান্ত বলিয়া উঠিল, একে নিয়ে যান।

—কেন কি হলো হে! ভোঁদা ত' আমার নোংরা কুচ্ছিৎ নয়! বলিয়া মানদা কাছে আসিতেই নলিনী তাহার আসনের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যে-বস্তুটা দেখাইয়া দিল, খাইতে বসিয়া তাহার নাম করিলেও মানুষের বমি হইবার সম্ভাবনা।

কাশীনাথ নাকে হাত দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ভোঁদাকে প্রহার করিবার জন্য এককড়ি থালা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মানদা তাড়াতাড়ি হাত আড়াল দিয়া বলিয়া উঠিল, খবরদার ওর গায়ে হাত দিসনে এককড়ে? দুপুর রাতে ছেলে এখুনি কেঁদে খুন হবে।

এককড়ি তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, হ্যাঁ, কেঁদে খুন হবে, ডাইনী কোথাকার! ও তো বসতে চায়নি, তুই কেন ওকে বসালি?

প্রত্যুত্তরে মানদা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মিনতির অসহ্য হইয়া উঠিল। বলিল, তোমায় আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হবে না মানদা, ওকে নিয়ে সরে যাও। এককড়ি, তুই চুপ কর।

মানদা বলিল, না মা, বক্তিমে কেন করবো, আজ ক'দিন থেকেই ছেলেগুলোর পেটের অসুখ হয়েছে তাই বলছিলুম। থালাটা তুমি সাজিয়ে রাখ, আমি আসছি।

এই বলিয়া ভোঁদাকে তুলিয়া লইয়া মানদা চলিয়া গেল। মিনতি

নলিনীকান্তর আসনখানা টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, তুমি উঠে হাত ধোও নলিনী, আমি আবার ঠাঁই ক'রে দিচ্ছি।

নলিনীকান্ত বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

মিনতি বলিল না, খাওয়া হয়নি, আমি জানি। বাইরে জল আছে, তুমি আঁচিয়ে এসো।

মিনতি আদেশ করিতে জানিত। কাজেই, নলিনীকান্তকে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নূতন থালায় অন্যত্রে খাইতে বসিতে হইল।

আহারাদির পর সে উপরে উঠিয়া গেলে, অচলাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া দিয়া মিনতি তাহাকে তাহার শয়নকক্ষের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

মিনতি তাহার নিজের ঘরটাই আজ মেয়ে-জামাইএর জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। অচলা ফিস-ফিস করিয়া মিনতির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, তোমার লজ্জা করে না, ছি! তুমি যাও।

না রে না। লজ্জার মাথা খেয়েছি,—সেও শুধু তোরই জন্যে আর, আমার পোড়া কপালের জন্যে।

কিন্তু শেষের কথাগুলা মিনতি এত আস্তে-আস্তে বলিতে বলিতে নামিয়া গেল যে, অচলা তাহা শুনিতেই পাইল না।

অতি সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিয়া অচলা দেখিল, নলিনীকান্ত পালঙ্কের একপ্রান্তে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া এমনিভাবে শুইয়া আছে,—দেখিলে বুঝিবার সাধ্য নাই যে, সে জাগিয়া ঘুমাইতেছে, না সত্যই ঘুমাইতেছে।

যাহাই হউক, অচলাও ধীরে ধীরে তাহারই একপাশে শুইয়া পড়িল।

নলিনীকান্ত জাগিয়াই ছিল। আজ তাহার এই মথুরাপুরীতে পদার্পণ করিয়া অবধি যে-সব সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিতেছিল,—একে ত তাহারই জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে, তাহার উপর,

অচলাকে এমনিভাবে কর্তব্যপালন করিতে দেখিয়া সে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। ড্যাম, ন্যাষ্টি, ফুল, গাধা ইত্যাকার অনেক কথাই সে অস্ফুটভাবে আবৃত্তি করিতে করিতে অচলার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল। কিন্তু তথাপি, স্বামীর এই কপট নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য অচলার কোনো চাঞ্চল্যই দেখা গেল না। নলিনীকান্ত এইবার একটুখানি জোরে-জোরে বলিল, এমন অসভ্য তো কোথাও দেখিনি বাবা! অনেক তপস্যা করে যাহোক শ্বশুরবাড়ী পেয়েছি! আর বলিহারী এর পতিভক্তি! আমার এতবড় অসুখ, তা একবার ভুলেও জিজ্ঞেস করলে না, কেমন আছ?—মরুক্ গে ছাই! কারেই-বা বল্‌ছি আর কেই-বা শুনছে!

এই বলিয়া নলিনীকান্ত কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। অচলার গায়ে হাত দিয়া বলিল, এই! ঘুমোবার জন্যে এলে নাকি? নীচে ঘুমোবার জায়গা ছিল না?

অচলা কোনও কথা বলিল না।

নলিনীকান্ত আবার বলিল, কি রকম মেয়ে রে বাবা! এতদিন পরে এলুম, মুখে একটা কথা নেই, হাসি নেই…

অচলার ঠোঁটের প্রান্তে এইবার একটুখানি হাসির আভাস দেখিতে পাওয়া গেল। বলিল, কি বলচো?

নলিনী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, এতক্ষণে কি বলচো? বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি, চিঠিতে তো খুব পতি ভক্তির ছড়াছড়ি থাকে, সেগুলো কেউ লিখে দেয়, না নিজেই লেখো?

চিঠির কথায় অচলার অত্যন্ত লজ্জা হইল। বলিল, কেন, কি হলো?

জানো না, কি হলো? এসে অবধি তো বজ্জাত ছেলেগুলো আমায় একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিলে,—ছেলে তো নয়,—মনে হয় আচ্ছাটি করে জল-বিছুটি দিয়ে দিই। আর তাতেই-বা কি

হবে? আমার এই আদ্দির 'টেনিস্' খানা—ইস্ এমন 'স্পটেড' হয়ে গেছে যে, আর গায়ে দেওয়া চলতে পারে না।

এই বলিয়া ছোটদের উপর ব্যর্থ আক্রোশে এবং জামার শোকে নলিনীকান্ত এত বেশী অধির হইয়া পড়িল যে, অচলার পতিভক্তির ত্রুটি ভুলিয়া গিয়া সে তাহার 'স্পটেড' টেনিসখানার প্রতি ঘন-ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল।

অচলা বলিল, সেটা কি আমার দোষ? দিদির ছেলেরা অমনি বজ্জাত, তা কি করবে বল?

কথাটা শুনিয়া নলিনীকান্ত বলিয়া উঠিল, ওরে বাবা! এও দেখছি ওদেরই দলে? বলে, তা কি করবে বল? তাই ব'লে এমনি ক'রে আমার জামাটা নষ্ট করে দেবে? আমার স্যুট্‌কেসটা ভেঙ্গে দেবে? আর, আমায় যা-না-ইচ্ছে-তাই ব'লে গালাগালি দেবে? জানি, জানি, তুমিও তাই! ,তা নাহলে—আমি না হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম,—তা একবার ঠেলা দিয়েও জিজ্ঞাসা করলে না কেমন আছ? শিক্ষা দরকার, শিক্ষা দরকার, তোমাদের রীতিমত শিক্ষার দরকার।

নিরর্থক খানিকটা চেঁচাইয়া নলিনীকান্ত অবশেষে বোধ করি ক্লান্ত হইয়াই চুপ করিল। অচলা এইবার মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাকে তো বেশ ভালই দেখছি, চিঠিতে আমায় তবে মিছে কথা লিখেছিলে কেন?

নলিনীকান্ত বলিল, নাও! শোন একবার কথা!—তোমরা সব পাড়াগাঁয়ের ভূত, সে-সব 'ইন্টারনেল ডিস্ইজ' (Internal disease), বাইরে থেকে তার কি ছাই টের পাবে? কি রকম 'উইক' হয়ে গেছি, দেখলে বুঝতে পার না? হ'তে কায়দা-দুরস্ত 'এডুকেটেড' মেয়ে, ত, বুঝতে!—সেই যে লিখেছিলে 'ফাষ্টবুক' আরম্ভ করেছি,—কতদূর হলো?

অচলা ভয়ে-ভয়ে বলিল, ব্যাঙের পাতা পর্য্যন্ত।

—এখনও ব্যাঙের পাতা? এতদিন শেষ করা উচিত ছিল। ওয়ার্ডবুক' এনে দিতুম।

—'ওয়ার্ডবুক'ও তো পড়ায়।

—কে পড়ায়? মাষ্টার?

—ধেৎ! মাষ্টার কেন পড়াবে!—বলিয়া একটুখানি থতমত খাইয়া অচলা বলিল, মা পড়ায়।

নলিনীকান্ত বলিল, কে? ওই, হ্যাঁ, বুঝেছি। ও বেশ 'এজুকেটেড', না?

অচলা বলিল, হ্যাঁ, খুব ভাল মেয়ে।

—এই তো মুস্কিল! এতটা ইংরেজী কথা বললুম,—সামান্য কথা, তাও বুঝতে পারলে না। এজুকেটেড! এজুকেটেড! ই, ডি, ইউ, সি, এ, টি, ই, ডি,—এডুকেটেডও হয়। মানে শিক্ষিতা—শিক্ষিতা! —আচ্ছা থাক্! এই কাপড়টি তোমার এমন ক'রে কে পরিয়ে দিলে? ও-ই বুঝি?

—পরিয়ে কেন দিতে হবে? আমি নিজেই তো পরতে জানি।

—হ্যাঁ, জানো! এ যে বাবা একেবারে কলকাতার মতো! এ আর তোমায় জানতে হয় না। বেশ, বেশ, এমনি ক'রেই প'রো।

একটুখানি থামিয়া নলিনীকান্ত আবার বলিল, আচ্ছা, টাকা কি তুমি ঠিক ক'রেই রেখেছ? আমায় বিশ্বাস হয় তো দিতে পার। এই বলিয়া অচলাকে কাছে টানিয়া লইল।

অচলা বলিল, যাবার দিন নিও।

নলিনীকান্ত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাহ'লে আরও দু'একদিন আমাকে ছেড়ে দিতে চাও না, এই তো? কিন্তু—আচ্ছা, আরও দিন-দুই আমি থাকতে পারি, পরশু আমাকে যেতেই হবে।

—হ্যাঁ গা, কি অসুখ? আমি বুঝতে পারলুম না।

—সে আর বুঝবে কেমন ক'রে? ডাক্তাররাই বুঝতে পারে না। একবার ব্লাড একজামিন্ করিয়ে গোটাকয়েক 'ইন্জেকশান্' নিতে হবে।—সেকেণ্ড-ইয়ারের পড়া কি বাবা সোজা কথা? কম পরিশ্রমটা হয়! কি রকম 'উইক্' হয়ে গেছি, সে তো বুঝতেই পারচো।—এই বলিতে বলিতে সে যেন পত্নীপ্রেমের আবেগে ভয়ানক মাতিয়া উঠিল। অনেক আদর-সোহাগ করিয়া অবশেষে বলিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়াই বোধকরি বলিল, মহাভারত পড়েছ? তাতে এমন-সব মেয়েদের 'ক্যারেক্টার' আছে, একেবারে পতিভক্তির চরম। মেয়েদের পড়া উচিত।

অচলা বলিল, পড়েছি।

—হ্যাঁ, বেশ করেছ? তাতে দেখেছ তো, 'হাস্বেণ্ডের' জন্যে তারা কি-ই না করেছে! কই, নাম কর দেখি দু'একটা?

অচলা এই 'হাসবেণ্ড' কথাটার মানে জানিত, বলিল, অনেক আছে। সতী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী—

অচলা এমনি আরও অনেক নাম করিতে যাইতেছিল, নলিনী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, হ্যাঁ, পড়েছ—পড়েছ। আর বলতে হবে না।

কিন্তু নলিনীকান্ত নিজেও কোনদিন এই সুবৃহৎ মহাকাব্যটি পাঠ করিতে পারে নাই। সম্প্রতি কলিকাতার থিয়েটারে কি-একটা অভিনয় দেখিয়া আসিয়া মহাভারত সম্বন্ধে তাহার বিস্তর জ্ঞান জন্মিয়াছিল। বলিল, শেষের ওই দ্রৌপদীটা ছাড়া সাবিত্রী-টাবিত্রী আমি যা বললুম তাই বটে, কিন্তু দ্রৌপদীর তো 'ফাইভ্ হাস্বেণ্ড'! আর একটা বলতে পারলে না, কর্ণের ওয়াইফ—নামটি কি দাঁড়াও ভুলে যাচ্ছি। সে একেবারে 'গ্রাণ্ড'! কর্ণ বললে, আমাদের এই ব্যাটাটাকে কেটে ফেলব। তৎক্ষণাৎ! স্বামীবাক্য তারা কখনো 'নেগলেক্ট' করতে পারে না। সে যদি কলকাতার থিয়েটার ছাখো

একবার অচলা! নিজের ছেলে,—যেমনি তার মুণ্ডুটা কেটে ফেলেছে, ব্যস্! কেষ্টঠাকুর মাথার ওপরে অমনি তড়াক্ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল! সে একেবারে কিছু বোঝবার জো নেই! ওই মহাভারত-টহাভারতে এমন-সব মেয়ের কথা আছে, স্বামীর জন্যে যারা সব করেছে, অনেক কষ্ট সয়েছে, স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথা পর্য্যন্ত বলেনি। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কেউ বা নিজের হাতে স্বামীর আর একটা বিয়ে পর্য্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ বা—এই ধরো, কর্ণ যদি তার ছেলেটাকে না কেটে তার স্ত্রীর কাছে বলত, আমি বড় বিপদে পড়েছি, দে তোর গয়নাগুলো দে। সে কি আর 'না' বলত? তৎক্ষণাৎ একটি একটি ক'রে সব খুলে দিত।

অচলার মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না। এই প্রিয়দর্শন শিক্ষিত স্বামীর হিতোপদেশগুলি তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে লাগিল।

দশ

গ্রামের কয়েকজন ছোক্‌রা বেকার বসিয়াছিল। তাহাদের না ছিল কোন কাজ ঘরে,—না ছিল বাহিরে। অনেকেই ব্রাহ্মণ-সন্তান; কাজেই একমাত্র চাকরী ছাড়া আর কোনো হীনতা স্বীকার করিতে তাহারা অক্ষম। অথচ চাকরিও জোটে না,—জোটে তো টেকে না। এইরূপ নানাপ্রকার হাঙ্গামায় পড়িয়া তাহারা একেবারে 'কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়' হইয়াই ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। অভিভাবকেরা দিনের মাথায় লক্ষবার হতভাগাদের একটা কিছু করিতে বলেন, কিন্তু কি যে করিবে তাহারা কিছুই খুঁজিয়া পায় না। এদিকে বিধবা মেয়ের মত ঘরে বসিয়া সময়ও কাটে না। অগত্যা সময় কাটাইবার জন্য একটা কিছু তাহাদের করিতেই হয়। চাঁদা তুলিয়া নেশা-ভাং খাইয়া কোনরকমে উপায়হীনের প্রচণ্ড বেদনা তাহারা ভুলিয়া থাকে। অনর্থক চেঁচাইয়া মাতলামী করিয়া তাহাদের সুদীর্ঘ অবসর যাপন করিবার তবুও যাহোক্‌ একটা কিছু পন্থা খুঁজিয়া পায়। কাজে কাজেই জমিদার এবং অজন্মার কবল হইতে বাঁচাইয়া, পল্লীর দরিদ্র গৃহস্থ দুঃখ-দুর্দ্দিনের জন্য যে কয়টি ধান-চাল সঞ্চয় করিয়া রাখে, উপযুক্ত বংশধরগণের কৃপায় ভবিষ্যতের সে ভাবনাটুকু ঘুচিতেও অধিক বিলম্ব হয় না।

দিন দুই তিন পরে নলিনীকান্ত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন সে এই ছোক্‌রাদের পাল্লায় পড়িয়া গেল। অন্ততঃ সেদিন তাহার কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত রহিল। জহুরীতে জহর চিনিতে পারে। নলিনীকেও তাহারা ঠিক চিনিতে পারিয়াছিল। সকলে মিলিয়া সেদিন বৈকালে তাহারা বারুইপুর যাত্রা করিল এবং এই সহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথ-

শ্রান্তি লাঘবের জন্য সকলেই কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিয়া লইল। নলিনীকান্তও বাদ রহিল না, কারণ আজিকার যজ্ঞে তিনিই ছিলেন যজ্ঞেশ্বর।

বারুইপুর হইতে রাধানগর ফিরিতে হইলে নদীর উপরে প্রকাণ্ড একটা আম কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া আসিতে হয়। সন্ধ্যা তখন সবে মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশে চাঁদও উঠিয়াছিল। মৃদু-মন্দ বাতাস বহিতেছে। ছোক্‌রাদের দিল খুলিয়া গেল। একজন চীৎকার করিয়া একখানা গান ধরিল। তাহার পাশের ছোক্‌রা সঙ্গে সঙ্গে খামোখা হাততালি দিয়া এই বেসুরা গানের তাল ও মাত্রা ঠিক করিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে তিনজন একসঙ্গে আসিতেছিল। একজন বলিয়া উঠিল নায়েব শালা খচ্চর হলেও জামাইটি বেশ করেছে, কি বল লাখু?

লাখু সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়। বল্‌ত এমন ফুর্ত্তিটি কে দেয়? সেদিন সেই ঘোষালদের জামাই-শালাকে বললুম, বলি, দে বাবা, নিদেন্‌-পক্ষে গণ্ডা-কতক পয়সাও দে, গাঁজা চলুক।

তৃতীয় ব্যক্তি সহসা তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল সে-ব্যাটা চামার চামার! শালা হয়ত' নিজেই খেতে পায় না।

সকলের পশ্চাতে যে দুইজন আসিতেছিল, তাহার মধ্যে নলিনী-কান্ত একজন। নলিনীকান্ত বলিতেছিল, বিয়ে আবার মানুষে করে! হ্যাঁ, একশোবার করতে পারে, যদি মনের মত বৌ হয়। আর, তা যদি না হয়েছে, তা হ'লেই ব্যস্‌, খতম! বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, বিয়ের আগে আমি এমন ভাল ছেলে ছিলুম যে, সিগারেটটা পর্য্যন্ত টানতুম না। তারপর যেই বিয়ে হওয়া,—আরে দূর, দূর! আমার বাবা ওই নায়েবটার কাছে কিছু টাকা ধার্‌তো তাই, না হলে কোন শালা বিয়ে কর্‌তো! মন খারাপ হয়ে গেল। যা' তা আরম্ভ করলুম। কলকাতার মত শহরে অভাব ত' কিছুই নাই,—এই ক'

মাসের মধ্যেই একেবারে চরম হয়ে গেল। যাক্, এসব কথা আর কাউকে বলো না ভাই।

সঙ্গী বলিল, আরে রাম বল। আমাকে সে রকম ভেবো না। এক একদিন নেশার ঝোঁকে এমন সব কাজ ক'রে ফেলেছি, আজ যদি সে-সব কথা ব'লে দিই, তাহ'লে ওই শালার-বেটা-শালাদের ফাঁসি শূলি হয়ে যায়। আমি বাবা সে ছেলে নই,—এমন এক-আধটা কথা তো দূরের কথা, এই পেটের ভেতরে হাতী হজম হয়ে যায়।

এমনি সব এলোপাথারি চীৎকার করিতে করিতে কোন রকমে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় তাহারা সকলে নিরাপদে গ্রামে পৌঁছিল।

নলিনীকান্ত চোরের মত চুপি চুপি বাড়ী ঢুকিয়া একেবারে উপরে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। কাশীনাথ খাইবার জন্য ডাকিতে আসিলে উঃ! আঃ! করিয়া বার-দুই পাশ ফিরিয়া বলিয়া দিল, শরীর আজ তাহার ভয়ানক খারাপ, সে কিছুতেই খাইতে পারিবে না।

রাত্রে অচলা জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা কি হয়েছে? খেলে না যে? কোন রকমে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া নলিনী উত্তর দিল, অসুখ।

কিন্তু সস্তা মদের উৎকট গন্ধ অচলার নাকে লাগিতেই সে বলিল, তোমার মুখ থেকে এ কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে? হ্যাঁগা? আজ এত রাত্রে ফিরে এলে, কোথায় গিয়েছিলে?

নলিনীকান্ত বলিল, আমার সেই অসুখটা কাল থেকে ভয়ানক বেড়েছে, তাই বারুই পুরের ডাক্তারখানা থেকে একটু ওষুধ খেয়ে এলুম। এই ওষুধটা খেলেই আমি একটুখানি ভাল থাকি।

কথাটা অচলা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কারণ নলিনী যে রোগে ভুগিতেছে, ইহা তাহার মুখের কথায় বিশ্বাস না করিলেও অচলা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। গতকল্য মাঝে মাঝে রোগযন্ত্রনায় নলিনী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার সেই কাতরতা অচলা একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছে। রোগটা যে কি এবং তাহার

দেহাভ্যন্তরের কোন্ গুপ্তস্থানে যে সে ব্যাধির বীজ সুপ্ত রহিয়াছে, অচলা তাহা ঠাহর করিতে না পারিলেও, রোগ যে তাহার হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত।

নেশার ঝোঁকে নলিনী আবোল্-তাবোল্ বকিতেছে। মাঝে মাঝে কেমন যেন সে উন্মনা হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া অচলা তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, অমন করছ যে? অসুখ কি খুব বেশী হয়েছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরো—বলিয়া নলিনীকান্ত অচলাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াই খাট হইতে নামিয়া পড়িল এবং ঘরের মেঝের উপর বসিয়াই বমি করিতে লাগিল।

অচলার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। লজ্জা-সরম তাহার কোন্দিকে চলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিয়া অচলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কি যেন একটা কথা বলিতে গেল কিন্তু বলিতে পারিল না। প্রাণপণে তাহাকে বসাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাও পারিল না। নলিনীকান্ত মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। ঘরেই জল ছিল; অচলা তাহার মুখে-চোখে জল দিয়া বলিল, বিছানার উপরে উঠে শোও, আমি এটা পরিষ্কার ক'রে দিই।

নলিনীকান্তের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, না—না, চেঁচিও না। বেশ আছি।

অচলার চোখ দুইটা অনেকক্ষণ হইতে ছল্ছল্ করিতেছিল, এইবার সে ঝর্ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, ওগো, অত জোরে কথা বলো না, পাশের ঘরে ওঁরা শুয়ে আছেন, এখনই হয়তো—

অচলা আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার ভয় হইতেছিল, তবে কি সে মদ খাইয়া আসিয়াছে! তাহাদের বড় জামাই হিতলাল মাঝে মাঝে এমনি করে। দিদি বলে, সে মদ খায়। তবে বুঝি

তাই। তাহা না হইল ঔষধের গন্ধ তো এত তীব্র হইতে পারে না।

অচলা আর থাকিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, মদ খেয়ে এসেছ?

বমি করিয়া নলিনীকান্তর ঘুম পাইতেছিল, জোরে জোরে বলিল, মদ খেয়েছি, হ্যাঁ, খেয়েছি তো! বেশ করেছি। তোমার জন্যেই আমার আজ এই দুর্দ্দশা! কি করতে পার তুমি?

অচলা বলিল, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আস্তে আস্তে কথা কও। লোকে যদি জানতে পারে তুমি মদ খেয়েছ,—কি বলবে? তোমার নিন্দে যে আমি সইতে পারব না। লোকে যে তোমায় খুব ভাল ব'লেই জানে।

প্রত্যুত্তরে নলিনীকান্ত একটি কথাও বলিল না। বোধকরি ঘুমের ঘোরে সব কথা সে শুনিতেও পায় নাই। দেখিতে দেখিতে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অচলা তাহাকে উঠাইয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিল না। মাথার নীচে একখানা বালিশ ধরিয়া দিয়া, অতি সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া পা টিপিয়া সে নীচে নামিয়া গেল এবং মিনিট-পাঁচেক পরেই এক কলসী জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। এবং সেই মধ্যরাত্রে বাড়ীর সকলে যখন ঘুমাইয়া আছে, অচলা দুই হাত দিয়া নলিনীকান্তর বমিটুকু ঘরের মেঝে হইতে নিঃশব্দে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেও অবশেষে তাহার একপার্শ্বে ভূমিশয্যায় আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

আজিকার মত বাহিরের সর্ব্বপ্রকার লোকনিন্দা এবং অপবাদ হইতে তাহার স্বামীকে বাঁচাইয়া এতক্ষণে সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু সুরার তীব্র গন্ধে এবং নিজের দুশ্চিন্তায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চোখে তাহার ঘুম আসিল না।

পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় একটা কচি ছেলে কোলে লইয়া একজন ভিখারিণী তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অভয়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বলিল, মা, চারটি ভিক্ষে দাও মা, কাল থেকে কিছু খেতে পাইনি।

প্রতিদিনের অভ্যাস মত অভয়া দাঁত খিঁচাইয়া উত্তর দিল, সকাল বেলা তোর জন্যে ভিক্ষে নিয়ে কেউ বসে নেই, বেরো হারামজাদী!

ভিখারিণী কহিল, ভিক্ষে না দাও, এক ঘটি জল দাও মা, খেয়ে নি!

অভয়া বলিল, হ্যাঁ, এই যে! জল তোর জন্যে এনে রেখেছি কিনা! বেরো, নদীতে খেগে যা,—পুকুরে খেগে যা!

মানদা কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল, তোর কোলে এ ছেলেটা কার?

—আমারই মা।

—আর ক'টি আছে?

—আরও ছোট ছোট দুটি আছে মা, তারা ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। দে মা, একটু জল দে খাই।

ঠোঁট উল্টাইয়া মানদা বলিল জল নেই, যা। পেটে ভাত জোটে না, তার আবার তিন তিনটে ছেলে।

বেগতিক দেখিয়া ভিখারিণী সরিয়া পড়িল। পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। রাসবিহারীর বাহিরের বৈঠকখানার রকে, দেয়ালের কোল ঘেঁসিয়া যে ছায়াটুকু পড়িয়াছিল, সেইখানে একটুখানি শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের উপর তাহার ঘুমন্ত শিশুটিকে শোয়াইয়া দিয়া ভিখারিণী বোধ করি পুকুরের জল খাইতে গেল। অভয়ার ছেলেগুলা রাস্তার উপর ছুটাছুটি মারামারি করিতেছিল। এই কচি ছেলেটার উপর হঠাৎ তাহাদের শুভদৃষ্টি পড়িতেই তাহারা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দুষ্ট বুদ্ধিতে কালিন্দী

ছিল অদ্বিতীয়। এই অবসরে গোবিন্দ ও ভোঁদাকে ছেলেটার মাথার দিকে ধরিতে বলিয়া, নিজে তাহার পা দুইটা টানিয়া ধরিয়া, সুমুখের নালার ভিতরে ছেলেটাকে ফেলিয়া দিল এবং সকলে মিলিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া মজা দেখিতে লাগিল।

পুকুরে কাপড় কাচিয়া সেই রাস্তা দিয়া অচলা বাড়ী ঢুকিতেছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে একেবারে শিহরিয়া উঠিল। ছেলেগুলোকে নিষেধ করা বা শাসন করিতে যাওয়া বৃথা,—হয়ত তাহারা এখনই তাহাকে মারিতে আসিবে। তাই সে কাহাকেও ডাকিবার জন্য ভিজা কাপড়েই ঘরের ভিতর ছুটিয়া আসিল। দেখিল, উঠানে মিনতি দাঁড়াইয়া আছে। মুখে কোন কথা না বলিয়া তাহাকেই টানিতে টানিতে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া ব্যাপারটা দেখাইয়া দিল। ছেলেটা তখন নর্দ্দমার ভিতরে পড়িয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছিল। মিনতি কোন কথা না শুনিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সর্ব্বপ্রথমে ছেলেটিকে তুলিয়া ফেলিল এবং অতি যত্নে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া অচলাকে বলিল, সে ভিখারী মেয়েটা কোথায় গেল অচলা ?

—বোধহয় ওই পুকুরে গেছে।—এই যে এসেছে।

ছেলের কান্না শুনিয়া ভিখারিণী পুকুর হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। মিনতি তাহার কোলের উপর ছেলেটিকে তুলিয়া দিয়া বলিল, এমনি ক'রে ছেলে ফেলে দিয়ে যায় কখনো ?

ভিখারিণী কিছুই বলিতে পারিল না। সকরুণ নয়নে একবার মিনতির দিকে এবং একবার তাহার ক্রন্দনরত শিশুপুত্রের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল।

মিনতি অচলাকে চুপি চুপি বলিল, আলমারী থেকে একটি টাকা এনে দে অচলা।

অচলা চলিয়া গেল। কালিন্দী, ভুতো, গোবিন্দ, ভোঁদা ইত্যাদি তখনও একটু দুরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। মিনতি বলিল, আয়

হতভাগা ছেলে, আজ আর কারো কথা শুন্‌ব না, তোমাদের মেরে খুন করবো।

গোবিন্দ মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, হ্যাঁ করবি? তুই কে আমাদের যে, মারবি?

কালিন্দী একটা ইট্‌ তুলিয়া লইয়া মিনতির দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

মিনতি সরিয়া দাঁড়াইতে ইটখানা সেই ভিখারিণীর পাঁজরার উপর এত জোরে আসিয়া লাগিল যে, সে মাগো! বলিয়াই সেইখানেই থপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কাপড় ছাড়িয়া অচলা টাকা আনিয়া দিল। মিনতি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, শীগ্‌গির পালিয়ে যা এখান থেকে হতভাগা মেয়ে—ছি! ছি! এখানে কখনও আসতে হয়! আর যদি কখনও এদের দোর মাড়াস—

কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। মানদা অনেকক্ষণ হইতে বাহিরের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই-সব দেখিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার অত-সব ছোঁয়া-ছুঁয়িতে দরকার কি বৌ? তা বেশ করেছ। ও কি-জাত না কি-জাত,—ছুঁয়েছ যখন চট ক'রে ডুব দিয়েই ঘরে ঢুকো। ছেলেয়-ছেলেয় কি করছে না করছে ওরাই বুঝতো তুমি আবার গেলে কেন?

মিনতি আজ কোন রকমেই নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, তুমি চুপ কর মানদা, অভয়ার ছেলেগুলিকে তুমিই নষ্ট করেছ। তা নইলে ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে এমন কখনও হয় না।

—আমি থাকলে তো তোমাদের সুবিধে হয় না বৌ, তা কি আমরা জানিনে। খুব জানি। তা বেশ, বাবু আসুক, চলে যেতে বলে, চলেই যাব।—এই বলিয়া মানদা বোধ হয় একটা কিছু ষড়যন্ত্র করিবার জন্য হন্‌ হন্‌ করিয়া অভয়ার কাছে চলিয়া গেল।

মিনতি বলিল, অচলা, আমাকে একটু দাঁড়িয়ে দিবি আয় ভাই, পুকুরে আমি স্নান ক'রে আসি।

—চল, বলিয়া খানিকটা আগাইয়া গিয়া মিনতিকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে বলতে ছোঁয়াছুঁয়ির বাচ-বিচার তুমি মানো না, তবে আবার চান্ কর্‌তে চল্‌লে কেন ?

—নিজের ইচ্ছায় আমাদের ত' কোন কাজ করবার জো নেই অচলা, আমরা যে বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মেছি ভাই। এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মিনতি কহিল, আমার ভয় হচ্ছে অচি, জামাই ঘরে রয়েছে, মানদা একটা কুরুক্ষেত্র না বাধিয়ে বসে।

মিনতি স্নান করিয়া ঘরে ফিরিতেই দেখিল, সে যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই হইয়াছে। রান্নাঘরের রকে বসিয়া অভয়া ও মানদা তাহারই কথা লইয়া চীৎকার করিতেছে।

মিনতিকে আসিতে দেখিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অভয়া বলিতে লাগিল, বাবা এলে সব কথা বল্ মানদা, আমিও বলি। আমাদের চব্বিশঘণ্টা গাল-মন্দ দিচ্ছিস, যা বলছিস বল, তা না, আবার বৌ ঝি মানুষ হয়ে ছেলেগুলোকে তেড়ে' তেড়ে' মারতে যাওয়া কি লা ? তাও যদি জান্‌তুম, বাছারা আমার দোষ-ঘাট করেছে—

মিনতি তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছে গিয়া বলিল, দোষ-ঘাট আমারই হয়েছে মা, আজকের মত চুপ করো। ঘরে জামাই রয়েছে শুনলে কি বলবে বলত ?

তাহাদের চুপ করিতে বলায় অভয়া যেন আরও বেশী লাফাইয়া উঠিল। বলিল, হ্যাঁ চুপ কোর্‌ব, বাবা আসুক।

অচলা উঠানে দাঁড়াইয়াছিল, সহসা উপরের জানলায় ঠক করিয়া একটা শব্দ হইতেই সে তাকাইয়া দেখিল, নলিনীকান্ত হাতের ইসারায় তাহাকে ডাকিতেছে। স্পষ্ট দিবালোকে পাছে কেহ ইহা

দেখিতে পাইয়াছে ভাবিয়া অচলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কিন্তু কি করিবে, বাধ্য হইয়া চোরের মত ধীরে ধীরে তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল।

নলিনীকান্ত বলিল, কতক্ষণ থেকে এম্‌নি শব্দ করছি, তুমি কি শুনতে পাও না? চান ক'রে খেয়ে-দেয়ে আমি যে আর ট্রেণ পাব না অচলা। আমাকে আজ যেতেই হবে।

অচলা ধীরে ধীরে বলিল, আজই যাবে?

হ্যাঁ, তোমাকে তো বলেছি। আমি কাল দশটা টাকা নিয়েছিলুম নয়? বাকী টাকাটা কোথায় রেখেছ? নীচে আছে নাকি?

—না। এইখানেই আছে, দিই। বলিয়া অচলা আলমারিটার কাছে সরিয়া গেল।

অচলা একটুখানি খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, নলিনীকান্ত বলিল, হ্যাঁগা, খোঁড়াচ্ছ যে?

কিন্তু কথাটা বলিয়াই নলিনীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল।

—ও কিছু না। কাল থেকে আমার কি যেন হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না। বড় কষ্ট হচ্ছে। বলিয়া আলমারি হইতে টাকাগুলা আনিয়া অচলা তাহার হাতের কাছে নামাইয়া দিল।

নলিনীকান্ত সে সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। বলিল, তুমি যাও অচলা, এখনই হয়তো কেউ এসে পড়বে।

অচলাও আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইবার সময় দরজার নিকট হইতে নলিনীর মুখের পানে একবার সকাতর দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকাইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

নলিনীকান্তকে আরও দু'চারদিন থাকিবার জন্য রাসবিহারী একবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পড়ার ক্ষতি হইবে বলায় তিনি আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না, আহারাদির পর একখানা গরুর গাড়ী করিয়া তাহাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন।

জামাই চলিয়া গেলে অভয়া ও মানদা সুযোগ বুঝিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাসবিহারীর নিকট তাহাদের বক্তব্য নিবেদন করিল। ইতিমধ্যে ঘটনাটা তাহারা এমনিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল যে, আসামীর বিরুদ্ধে বিচারকের রাগ হইবারই কথা। কিন্তু আসামী তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষ; বাঁকিয়া বসিলে না-জানি এই বৃদ্ধ বয়সে কত লাঞ্ছনাই না সহিতে হইবে,—কাজেই, কাহাকেও বিশেষ কিছু না বলিয়া তিনি এই 'রায়' প্রকাশ করিলেন যে, অভয়া ও মিনতির এরূপভাবে একসঙ্গে বাস করা আর বেশীদিন চলিবে না। যাহা হউক অদ্য বৈকালে তাঁহাকে গ্রামান্তরে যাইতে হইবে, আগামী কল্য প্রাতে ফিরিয়াই তিনি ইহার একটা বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

সেদিন অপরাহ্নে চা ও আফিং খাইয়া বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে রাসবিহারী তামাক টানিতে টানিতে মিনতির নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক আদর সোহাগ করিয়া হাসিয়া কাশিয়া অবশেষে কহিলেন, ওগো শুনছ, আজ আমি মেহেরপুরে যাচ্ছি, কাল সকালেই ফিরবো। আবার শুনেছ মজা? অভয়া আর মানদা আজ তোমার নামে নালিশ করেছে। জানে না তো বাবা, ভেতরে ভেতরে আমাদের কতখানি—

অনেক দুঃখে মিনতি হাসিয়া ফেলিল।

রাসবিহারী বলিলেন, শোনো, একটা ফন্দি এঁটেছি, কাছে সরে এস।

মিনতি সরিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখখানা দেখিয়া মনে হইল, সে যেন নিঃসহায় নিরুপায় হইয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

রাসবিহারী বলিলেন, হাসছ না যে? তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমার প্রাণটা কেমন যেন করতে থাকে।

মিনতি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জোর করিয়া একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল।

রাসবিহারী হুঁকাটা হাত হইতে নামাইয়া বলিলেন, কাল সকালে ওদের সামনে তোমাকে আমি খুব খানিকটা বকবো। কিছু মনে করো না যেন। তারপর দেখবে মজা,—বাড়ী থেকে ওদের আমি দূর করে দেব।

মিনতির সহ্য হইল না। বলিল, না, না, ওদের কিছু বলতে পাবে না। দোষ আমার।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে ব্যবস্থা এর পর হবে। বলিয়া রাসবিহারী নামিয়া আসিলেন এবং সকলের সাক্ষাতে লখুকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ আমি মেহেরপুর চল্লুম, লখু। সেই পরেশ ছোঁড়াটাকে আজ সকালে দেখছিলুম, সে বোধকরি গাঁয়েই রয়েছে। তাকে একবার কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস্ তো। বিশেষ দরকার আছে।

এগার

রাসবিহারী মেহেরপুর চলিয়া গেলেন।

কালিন্দী কোথা হইতে বাই-সাইকেলে তেল দিবার একটা অয়েল্-ক্যান্ (Oil can) জোগাড় করিয়াছিল। তাহার ভিতর খানিকটা কেরোসিন তেল পুরিয়া সে এদিক-ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় গোবিন্দ আর ভূতো ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওটায় কি হয় রে ভাই?

—দেখবি কি হয়! বলিয়া কালিন্দী ভূতোর হাত ধরিয়া তাহাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার পেটের উপর পিচকারির মত সেই যন্ত্র হইতে খানিকটা কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিল। কিন্তু কালিন্দীর সাত খুন মাপ। তাহাকে কাহারও কিছু বলিবার জো নাই। কাজেই, ভূতো বারকতক ছি-ছি, ধেৎ! বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অচলা রান্নাঘরের একটা থামে হেলান্ দিয়া আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়াছিল। কালিন্দী কাছে গিয়া একেবারে তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল, অচলি! এই অচলি! দেখবি মজা?

অচলা একে তাহার নিজের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বসিয়াছিল, তাহার উপর এই ছেলেগুলার উৎপাত তাহার ভাল লাগিল না; বিরক্ত হইয়া বলিল, যা বাপু স'রে যা, সব সময় ভাল লাগে না।

প্রত্যুত্তরে কালিন্দী মুখে কিছু বলিল না, তাহার সেই 'অয়েল্-ক্যানের' সরু নলটা ধীরে ধীরে অচলার কানে ঢুকাইয়া বার-ছুই জোরে জোরে টিপিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে ছুটিয়া

পলাইয়া গেল। অচলা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কানের ভিতর অনেকখানি কেরোসিন তেল ঢুকিয়া গিয়াছে। কানে তালা লাগিয়া তাহার মাথাটা পর্য্যন্ত ভোঁ ভোঁ করিতেছিল। কি যে করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অচলা ডাকিল, তোর কেলোর কাজ দেখে যা দিদি। উঃ! বাবা রে! মর্ হতভাগা ছেলে, এক্ষুনি মরে যা—উঃ! মাগো! বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল আসিয়া পড়িল।

অভয়া বোধকরি ঘরের ভিতরেই ছিল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া অচলার গালের উপর ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া বিশ্রী মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, তুই মর্ না হারামজাদি, ওরা কেন মরবে? ষাট। ষাট! মরা ছাড়া আর গাল নাই হতভাগীর!—এই বলিয়া দুই হাত দিয়া অচলার গাল দুইটা সজোরে টিপিয়া দিয়া অভয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অচলা হতভম্ব হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিল, পরে আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া নীচের ঘরে গিয়া একটা খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

মিনতি কিছুই জানিত না। অচলার খোঁজ করিতে আসিয়া দেখিল, অন্ধকার ঘরে খাটের উপর সে শুইয়া আছে। কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, এমন অসময়ে তুই শুয়েছিস্ যে অচি? চল্, ওপরে চল্।

মুখ না তুলিয়াই অচলা বলিল, না, তুমি যাও।

তাহার কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিনতি বলিল, অমন ক'রে কথা বলছিস্ যে অচি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি তো?

—না। বলিয়া অচলা পাশ ফিরিয়া শুইল।

—তুই আয়, আমি চল্লুম। বলিয়া মিনতি উপরে উঠিয়া গেল।

ছেলেদের খাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় মানদা ডাকিল, ওপর থেকে নেমে এসো বৌ, বাবু ঘরে নেই, আজ সকাল-সকাল হেঁসেল তুলে দিই।

মিনতি নীচে আসিয়া দেখিল, অচলা তখনও তেমনি ভাবে পড়িয়া আছে। বলিল, ওঠ অচলা, চল, খেয়ে নি গে। আজ তোর বাবা ঘরে নেই, আমার কাছে শুতে হবে তোকে।

যন্ত্রণায় অচলা ঘুমাইতে পারে নাই, সে জাগিয়াই ছিল। ঘুমাইবার ভান করিয়া কোনও উত্তর দিল না।

তাহাকে নড়াইয়া জাগাবার চেষ্টা করিয়া মিনতি বলিল, খাবিনে অচলা?

তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার কাছে মুখ লইয়া গিয়া মিনতি বলিল, আজ কি সারা দিন-রাত এমনি করে পড়ে পড়ে কাঁদবি? ভাবিসনি, আবার আসবে।

অচলা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, যাও, বেশী চেঁচিও না।

এমন করিয়া কথা সে কোনদিনই বলে না। আজ নিশ্চয়ই কিছু হইয়াছে ভাবিয়া মিনতি আবার প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে? নলিনীর জন্যে মন কেমন করছে? বল না অচি?

এইবার অচলার রাগ হইল। আজ সারা দিন ধরিয়া তাহার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। স্বামী চলিয়া যাওয়ায় মনে তাহার এতটুকু কষ্ট হয় নাই, তবে কাল হইতে শরীরটা তাহার বড় অসুস্থ বোধ হইতেছিল,—কানের যন্ত্রণা থামিয়া গেলেও, কোথায় যেন আর-একটা কিসের অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহাকে মাঝে-মাঝে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু কি যে হইয়াছে, তাহা সে নিজেই জানে না, বুঝে না, বুঝাইতেও পারে না। মিনতির হাতখানা সরাইয়া দিয়া অচলা বলিয়া উঠিল, বলছি আমি যাব না এখন, তুমি কেন সাধাসাধি করছো বল ত?

—তাহ'লে খাবি না? এমনি নীচের ঘরে মুখ গুঁজে প'ড়ে প'ড়ে মশার কামড় খাবি?

—হ্যাঁ, তুমি যাও, খেয়ে নাও গে—বলিয়া অচলা ভাল করিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইল।

মিনতির এইবার একটুখানি অভিমান হইল। বলিল, তবে তোর যখন খুশী খেয়ে ওপরে গিয়ে শুস্, আমি দরজা খুলে রাখব।

অচলা কোন কথাই বলিল না। মিনতি চলিয়া গেল। পরে, অচলা যখন উপরে উঠিয়া গেল, রাত্রি তখন এগারোটা। দরজা খোলাই ছিল। ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া খাটের একপাশে অচলা শুইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার উঠিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। খোলা জানালার পাশে গিয়া মিনিট-কয়েক বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও চলিল না। ঘরের এককোণে জলের কুঁজোটা তুলিয়া লইয়া অচলা ঢক্ ঢক্ করিয়া গ্লাস দুই জল খাইয়া ফেলিল।

মিনতি জাগিয়াই ছিল, এতক্ষণ ইচ্ছা করিয়াই কথা কয় নাই। অচলা জল খাইয়া ফিরিয়া আসিতেই মিনতি বলিল, খেয়ে এসে অত জল খাচ্ছিস কেন?

অচলা বলিল, খেয়ে ত' আসিনি।

মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, খেয়ে আসিস্ নি কেন?

—খাবার রাখে নি ত' কি খাব। বলিয়া অচলা পাশ ফিরিয়া শুইল। রাখে নি।—মিনতি অবাক হইয়া গেল। বলিল, ঘুম থেকে তোকে একবার উঠিয়েও দেয় নি, রাখেওনি? মানদাকে জিজ্ঞাসা করলি না কেন?

—করলুম। বললে, জানি না। ঘুমিয়ে ছিলি কেন?

মিনতি বলিল, আমি যে তখন অত ক'রে বললুম, উঠলিনে কেন অচলা? কি হয়েছিল তোর?

অচলা চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিনতি তাহার একখানা হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, নে ওঠ। চল্ খাবি।

অচলা কিছুতেই উঠিল না। বলিল, আজ আর কিছু খেতে পারব না।

মিনতি আরও কয়েকবার তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহাকে উঠাইতে না পারিয়া অবশেষে কহিল, তোর এই একগুঁয়েমির জন্যে আমার ভয় হয় অচি, সুখের মুখ হয়ত জীবনে কোনদিন তুই দেখতে পাবি না।

—তা জানি। তুমি ঘুমোও, আমার ঘুম পাচ্ছে। বলিয়া অচলা বিছানার পাশে আর একটুখানি সরিয়া গেল।

মিনতি সে রাত্রে আর কোন কথা বলিল না। পরদিন প্রাতে সর্ব্বপ্রথম অভয়ার নিকট হইতে ভাঁড়ারের চাবিটা চাহিয়া লইয়া সে খুটে বাঁধিল। তাহার পর স্নান করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া মানদাকে বলিল, এসো, আমাকে সব দেখিয়ে দেবে এসো। আজ থেকে রান্নাবান্না খেতে দেওয়ার ভারটা আমি নিলাম। তুমি দিনকতক জিরোও।

ব্যাপারটা মানদা যে বুঝিতে পারিল না তাহা নয়। ভয়ও তাহার একটুখানি হইল। অভয়ার কাছে গিয়া চুপি-চুপি বলিল, দেখলি অভয়া, কাল অচলিকে খেতে দিলিনে, আজ তার জন্যে গিন্নী কি করছে দেখ গিয়ে। ভাড়ারের চাবি খুঁটে বেঁধে হেঁসেলে ঢুকেছে! বলে, তোমায় রাঁধতে হবে না। নে, এবার ঠেলা বোঝ। আমি কিছু জানিনে বাপু।

অভয়া বলিল, জানিসনে কি রকম! তুই তো বেশ!—এই বলিয়া অভয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, বাবা তো এক্ষুণি আসছে, এলে আমি ভাল ক'রে বলি। অচলিই ত যত

নষ্টের মূল! তাকে খেতে দিইনি সে-কথা নাই বা বল্‌লুম মানদা, সে তো খাব না বলেই শুয়েছিল। দশবার ডাক্‌লুম, সে তো উঠলো না। আর বল্‌বি, চাবি, ও আমার হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বুঝলি?

এত বড় মন্ত্রী পাইয়া মানদার সাহস হঠাৎ বাড়িয়া গেল। বলিল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্। দেখি, ও কি করতে পারে!

বাহিরের উঠানের উপর ছেলেদের কোলাহল এবং রাসবিহারীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মানদা ও অভয়ার সমস্ত আলোচনা বন্ধ হইল। মানদা বাহিরে আসিয়া উঠান হইতে রাস-বিহারীকে শুনাইয়া শুনাইয়া ডাকিল, নেমে আয় অচলি, কাল থেকে কিছু খাস্‌নি,—আয়!

কথাটা এত জোরে জোরে বলিল যে, ঘরের ভিতর হইতে কালা হিতলাল পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে পাইল। সে তখন আহারের সন্ধানে এদিক-সেদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। অচলা কাল হইতে কিছু খায় নাই শুনিয়া হিতলাল অবাক হইয়া গেল। সুস্থ শরীরে কোনও মানুষ যে উপবাস করিয়া থাকিতে পারে ইহা তাহার ধারণার অতীত। অভয়ার কাছে গিয়া হিতলাল বলিল, ধন্যি মেয়ে বাবা তোরা, না খেয়ে মানুষ থাকে! যা, যা, শীগ্‌গির ও-ছুঁড়ীকে কিছু খাইয়ে দে, সকাল থেকে পেটে একগ্লাস জলও পড়েনি।

বার

কতক-বা বাকী খাজনার দায়ে নিলামে চড়িয়া, কতক-বা জোর-জবরদস্তিতে এবং কতক-বা পাকা-মাথার পাকা-বুদ্ধির চোটে গ্রামবাসী প্রজাদের অধিকাংশ সম্পত্তিই জমিদার ও নায়েবেব ঘরে গিয়া বেশ নির্ব্বিবাদেই প্রবেশ করতেছিল। জমিদারকেও সেইজন্য বাধ্য হইয়া রাধানগরের কাছারির পার্শ্বে একটা চাষ-বাড়ীও খুলিতে হইয়াছে। রাসবিহারী নিজে ত' সব দেখা-শোনা করিতেনই, তাহার উপর এই সব তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন হিন্দুস্থানী চাপরাশীও ছিল। নাম,—রঘুবীর চৌবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে নাম হমোরা? রঘুবীর-সীতাপতি-রামচন্দ্র চৌবে। নামটাও যেমন জম্‌কালো, আর-কিছু থাকুক্ আর না-ই থাকুক, তাহার গোঁফ-জোড়াটাও ঠিক্ তেমনি জম্‌কালো ছিল। এখন সে বুড়া হইয়া গেছে। চোখে ভাল দেখিতে পায় না। গায়ের চামড়া ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনের মত গায়ের 'তাগদ্'ও আর নাই। তবু সে প্রতিদিন কুস্তি লড়ে, কস্‌রৎকায়দার অভিনয় করে। ভাবে, গায়ের জোরে যৌবনকে সে বুঝি এখনও বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রঘুবীরের কয়েকটি তৈরী-করা গল্প আছে। তাহার কতক সত্য, কতক মিথ্যা। সে কতবার কেমন করিয়া দাঙ্গা জিতিযাছে, কতবার কতগুলা লোককে খুন-জখম করিয়া জেলে গিয়াছে, কতবার নিজের মাথা ফাটাইয়া পরকে বিপদে ফেলিয়াছে—ইত্যাদি কাহিনী নানাপ্রকারে অতিরঞ্জিত করিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া, সকলকে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করে। বাংলার জমিদারের তরফে চিরকাল চাক্‌রী করিয়া নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেও মন্দ শিখে নাই।

মেহেরপুর হইতে ফিরিয়া সেদিন আহারাদির পর রাসবিহারী কাছারীতে গিয়া বসিলেন। রঘুবীর তখন সবেমাত্র 'রোটি পাকাইয়া' আহারে বসিতেছিল।

রাসবিহারী বলিলেন, যাও তো রঘুবীর, পরেশটাকে একবার ধরে নিয়ে এসো ত! সকালে আসবার কথাছিল,—আসেনি।

রুটিগুলো ঢাকা দিয়া রঘুবীর তাহার মাথার প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ীটা সে-এক অদ্ভুত কৌশলে মিনিট-দুই এর মধ্যেই বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটা লাঠি হাতে লইয়া, নাগ্‌রা জুতা-জোড়াটা পায়ে দিয়া বলিল, মিশির্-পাড়াকা সেই পারিশ্? এৎনা বড় লউণ্ডা,—হরওয়াক্ত ইধার-উধার ঘুমকে ফির্‌তা,—ওহি?

রাসবিহারী কহিলেন, হাঁ, সেই পরেশ চাটুজ্যে, তুমি জল্‌দি যাও।

যথা সম্ভব দ্রুতপদে রঘুবীর পরেশের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। পুরাতন একতলা ছোট একটি দালান। বহুদিনের সংস্কার অভাবে জরাজীর্ণ। তাহারই সম্মুখের বারান্দার একটা খুটিতে ঠেস দিয়া পরেশ চুপ করিয়া আত্ম-সমাহিতভাবে কি যেন ভাবিতেছিল। পার্শ্বে একটা খড়ো চালায় একধারে একটা জ্বলন্ত উনানের উপর তরকারি না কি চড়ানো হইয়াছিল কিন্তু সেটা যে পুড়িয়া বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতেছে সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

রঘুবীর লাঠিটা একবার মাটিতে ঠুকিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই পরেশ যেন একবার চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইল। বলিল, এসো রঘুবীর, বসো।—তামাক খাও।

রঘুবীর বলিল, নেহি পারিশবাবু তামাকুল-উমাকুল পিনেকা ইয়ে ওয়াক্ত্ নেহি। চলিয়ে আপ্! বাবুজীকে পাশ্ একদফা যানে পড়ে গা।

—ও হ্যাঁ, লখু কাল একবার ডাক্‌তে এসেছিল বটে,—চল।

বলিয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনি অবস্থাতেই পরেশ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজা পর্য্যন্ত পরেশ চলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় রান্নাঘরের দিকে তাকাইয়া রঘুবীর কহিল, ভাত উত কে। কি হোবে বাবু। শালা কাউয়া আ-কে তো মারি দিবে।

—ও। বলিয়া পরেশ ফিরিয়া দেখিল, উনানে চড়ানো তরকারীটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেছে। আগুনের মত তপ্ত কড়াইটা উনান হইতে সে নামাইয়া দিল। ভাতগুলো ঢাকা দিয়া সরাইয়া রাখিল এবং ঘটির জলে হাত ধুইয়া হাত দুইটা মুছিতে মুছিতে রঘুবীরের সঙ্গে সে বাহির হইয়া গেল। বাহিরের দরজার শিকলটা রঘুবীর নিজেই টানিয়া দিল।

কাছারির সম্মুখে চালার উপর বিছানা পাতিয়া রাসবিহারী অর্দ্ধ-শায়িতভাবে বসিয়াছিলেন। পাশেই একটা প্রকাণ্ড নিম গাছ হইতে ফুর ফুর করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। ফরসীর নলটা মুখে লাগাইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে বালিশের উপর তিনি কাৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রঘুবীর ডাকিল, বাবুজী।

রাসবিহারী নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিয়া নলে বার কতক্ টান দিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সম্মুখে পরেশকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এসেছিস? বোস, এইখানে। বোস, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে।

পরেশ বসিল না, নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া বলিল, বলুন।

রাসবিহারী প্রশ্ন করিলেন, তুই গাঁয়ে আর কতদিন থাকবি পরেশ? কোথায় থাকিস্ আজকাল? গাঁয়ে ত তোকে খুব কমই দেখতে পাই।

রাসবিহারীর এই সহৃদয় আপ্যায়ন পরেশের কাছে কেমন যেন

অতি-ভক্তির মতই শুনাইল। কিন্তু ইহার বেশী সে আর কিছুই ভাবিতে পারিল না। মিথ্যা ঢুটো মুখের কথায় তাহার বুকের ক্ষুধা মিটিবার নয়, দিনে-দিনে এই সত্যটা বেশ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে। তাহার প্রতি কে যে কেমন ব্যবহার করিল, কে যে কতখানি ঘৃণা করিল এবং কে কতখানি ভালবাসিল, অভিজ্ঞ সংসারীর মত এই সব দুশ্চিন্তাগুলাকে তাই সে আজকাল বড় বেশী আমল দিতে চাহে না। দুনিয়ার দিগ্‌দারী আজ তাহার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। মানুষের ধান-মান লইয়া জাল-জয়াচুরি যেখানে যত চলে চলুক, কিন্তু প্রাণ-মন লইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা, এত বড় এই সভ্য জগতের জাগ্রত নর-নারীর দ্বারাই যে সম্ভব হতে পারে, ইহা সে আজ অসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে।

পরেশ বলিল, কবে এ গাঁ থেকে যাব ঠিক বলতে পারিনে, তবে এখন বোধ হয় দিন-কতক আছি।

রাসবিহারী কহিলেন, তুই এক কাজ কর পরেশ!

—কি কাজ বলুন!

রাসবিহারী বলিলেন, এইখানে উঠেই বোস্ না রে বাপু। ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি আর কথা হয়?

পরেশ কাছে আসিয়া বসিল, রাসবিহারী পুনশ্চ কহিলেন, জমি-জায়গাগুলো ত' বাকী-খাজনার দায়ে সব ঘুচোলি, আর কখনও করতে পারবি ব'লে ত বিশ্বাস হয় না। অন্য কোথাও বাড়ী-ঘর করবি ভেবেছিস নাকি?

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

—তবে এক কাজ কর্। চিরকালটা তো বাইরেই থাকিস্ বাড়ীটা তো এমনই পড়ে থাকে। তার চেয়ে কিছু টাকা দিচ্ছি, বাড়ীটা আমাকে লিখে দে। সেই টাকা নিয়ে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা কোথাও কিছু কর গে। বুঝলি?

সুমুখের নিমগাছটার দিকে পরেশ তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ অন্যমনস্কের মত বলিল, আমার বাড়ীটা? কবে চাই?

রাসবিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, বলিস তো আজই আমি টাকাটা দিয়ে লেখাপড়া করিয়ে নিই। এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিয়া বালিসটা কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, আর বিয়ে-থা করে বৌ নিয়ে যদি কখনও গাঁয়ে আসিস, তখন কি-আর ব্যবস্থা হবে না,—সে আমি ঠিক করে দেব।

পরেশের মাথার ভিতর সবই কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। রাসবিহারীর মুখের পানে সে তাকাইতে পারিল না, ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া বলিল,—আজ আমি আসি, এরপর একসময় বলব, এখনও আমার খাওয়া হয়নি।

রাসবিহারী বলিলেন, এর পর নয়, আজই তাহ'লে বলে যাস। টাকাটা আমি দিয়ে দোব। বুঝলি?

বেশ। বলিয়া পরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মনের আনন্দে রাসবিহারী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ধোঁয়া বাহির না হইলেও সেই শূন্য গুড়গুড়িটাতেই বেশ জোরে জোরে টান দিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে, পরেশকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, ফিরে এলি যে পরেশ? হেঁ হেঁ সেই ভালো; এসব দেওয়া-নেওয়ার কাজে দেরী করা উচিৎ নয়।

পরেশ হঠাৎ বলিয়া বসিল, দেখুন, বাড়ী আমি দেবো না, দিতে পারবো না।

রাসবিহারীর মুখের হাসি হঠাৎ মিলাইয়া গেল। বলিলেন, ব্যাটা-ছেলের একমুখে দু'কথা, সে আবার কি রকম রে? এই মাত্র বলে গেলি দেব, আবার এরই মধ্যে,—পথে কেউ শিখিয়ে দিলে নাকি?

—না। কেউ শেখায় নি। দোহাই আপনার! আমার সব নিয়েছেন, মাথা গুঁজবার এ-ঠাঁইটুকু আর নেবেন না!

কত অসহায় ভাবে পরেশ যে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল, তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্যামী ব্যতীত আর কেহই জানিল না।

রাসবিহারী এইবার একটু রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন, সব নিয়েছি কি রকম? আমি তোর কি নিয়েছি?

—যা নেবার তাই নিয়েছেন। তবে এইকথা আমি বলে যাচ্ছি—বাড়ীটা যদি কোনদিন দিতে হয়, দিতে অবশ্য একদিন হবেই,—তা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি দেবনা!—এই বলিয়া পরেশ চলিয়া যাইতেছিল। রাসবিহারী বলিলেন, ভারি তো আস্পর্দ্ধা দেখছি তোর! জোর করে আমি কখ্‌খনো কারও একটা কানা-কড়িও নিইনে, তা জানিস? আমি তোর কি নিয়েছি, তাই বলেই যা না স্পষ্ট করে?

পরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একবার হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। হাসিতে গিয়া তাহার কুঞ্চিত ওষ্ঠপ্রান্তে যে-অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইল, অতিবড় বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষ যখন কাঁদিবার উপক্রম করে, তখন তাহার সে মুখচ্ছবিতেও বোধকরি এত মর্ম্মদাহ, এত বিষজ্বালা লুকাইয়া থাকে না।

রাসবিহারী আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তোর জমি-জায়গা তো গেল বাকী-খাজনায়, জোর করে আমি তোর কি নিলুম বল্‌ তো?

—ভগবান জানেন। বলিয়া পরেশ তাহার কম্পিত ঠোঁট দুইটা দাঁত দিয়া প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

রাসবিহারী হাঁকিলেন তাহলে বাড়ীটা তুই দিবিনে।

বাহির হইতে জবাব আসিল—না। দেবো না।

ক্রোধে অধির হইয়া রাসবিহারী তক্তাপোশের বালিসের উপর সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, পারি তো দেখে নেবো।

আর কোনও কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। গুড়গুড়ির নলটা গড়্ গড়্ করিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু ধোঁয়া যখন কিছুতেই বাহির হইল না তখন সজোরে নলটা দূরে ছুঁড়িয়া দিয়া ডাকিলেন—রঘুবীর।

রুটিগুলা রঘুবীর প্রায় সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, তখনও একখানা মাত্র বাকী। হাঁ বাবুজী! বলিয়া পোয়া-খানেক ময়দার সেই শেষ চেলাটি তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঘুবীর যে-ধরণের মানুষ, তাহাতে সে পারে না, এমন কাজ নাই! বিশেষতঃ কোনও দুর্বিনীত অবাধ্য প্রজাকে জব্দ করিবার হুকুম পাইলে তাহার আনন্দের আর সীমা থাকে না,—এই বুড়ো বয়সেও তাহার পশু প্রবৃত্তি যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।

মনিবকে সে সাহস দিয়া বলিল, কুছ পরোয়া নেহি বাবুজি! হামি দেখি লিবে।

এবং পরেশকে দেখিয়া লইতে তাহার বিশেষ কষ্টও হইল না।

গত দশ-এগারো মাস ধরিয়া একফোঁটা বৃষ্টি নাই। গ্রামে তখন অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। নদীতে জল ছিল না, গ্রামের পুষ্করিণীগুলা প্রায় অধিকাংশই শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। যদিই-বা দু-একটা পুকুরে একটু-আধটু জল ছিল, জমিদার ও নায়েবের ইক্ষু চাষের জমি আবাদের জন্য সেটুকুও নিঃশেষে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। রাসবিহারীর বাড়ীর কাছে তাঁহার একটা পুকুর হইতে গ্রামবাসী প্রায় সকলেই জল লইতেছিল।

হঠাৎ সেদিন রাসবিহারী গ্রামের মধ্যে এক হুকুম জারি করিয়া দিলেন যে, তাঁহার পুকুরে বাহিরের কেহ জল লইতে, স্নান করিতে কিম্বা কাপড় কাচিতে পারিবে না; কারণ পুষ্করিণীতে অনেক টাকার মাছ আছে, সেগুলা মরিয়া গেলে তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হবে। কিন্তু ইহাতে অন্য কাহারও বিশেষ কিছু ক্ষতি হউক আর না-ই হউক,

বাগদি পাড়ার লোকগুলার পক্ষে এই নির্ম্মম নিয়ম পালন করা একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহাদের ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও খাবার জলের পুষ্করিণী নাই। এঁদো পচা পানায় ভরা একটা ছোট ডোবায় জল আছে, নাক কান বুঁজিয়া তাহাতে কোনরকমে স্নান চলিতে পারে কিন্তু সে জল মুখে দেওয়া দূরে থাক, তাহাতে বাসন মাজাও চলে না। দিন মজুর না খাটিলে এই ছোট লোকগুলার পেটের অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র, এ সব কিছুই জোটে না সত্য কিন্তু জগতের জীবন্ত প্রাণী হিসাবে অন্যান্য সকলেরই মত, পৃথিবীর জল হাওয়ার উপর তাহাদেরও যে একটা জন্মগত অধিকারের দাবী আছে, ইহা তাহাদের চিরকালের বিশ্বাস। তাই কোনরূপ শাসন বারণ না মানিয়া বাগদিদের মেয়েগুলা খাবার জলটুকু এই পুষ্করিণী হইতে বহিয়া আনিতে লাগিল। কিন্তু রঘুবীর চোবে যতদিন আছে, ততদিন জমিদারের হুকুম অমান্য করিয়া কেহ যে পরোক্ষভাবেও তাঁহাকে অপমান করিবে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। দুই তিন দিনের মধ্যেই এইসব ছোটলোকের বেয়াদপি রঘুবীর মারের চোটে বন্ধ করিয়া দিল। তাহাদের কষ্টের আর সীমা রহিল না। ক্রোশ দেড়েক পথ সেই ভীষণ রৌদ্রে হাঁটিয়া ভিন্নগ্রাম হইতে কেহ বা অতিকষ্টে এক আধ কলসী জল আনিতে লাগিল। আবার যাহাদের এই সময়টুকু নষ্ট করিলে পেটের ভাত জোটে না,—শুধু জল খাওয়াই সার হয়,—তাহারা বাধ্য হইয়া সেই পচা পুকুরের পাঁকজলটাই কোনরকমে ছাঁকিয়া লইয়া কাজ চালাইতে লাগিল।

কিন্তু এরূপভাবে বেশীদিন চলে না। তপ্ত শুষ্ক পিপাসার্ত্ত ধরিত্রীও যেন চোঁ চোঁ করিয়া এই খানা ডোবার জলটুকু সর্ব্বাগ্রে শুষিয়া লইতেছিল। অগত্যা নিরুপায় হইয়া তাহাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইল। রাত্রির অন্ধকারে দল বাঁধিয়া বাগদিদের মেয়েগুলো রাসবিহারীর পুকুর হইতে জল চুরি করিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই পুকুরের ঘাটটা যখন জনশূন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এমন সময় দুইজন কমবয়সী বাগদির মেয়ে পুকুরের উত্তর-দিকের গাছপালার ঝোপের ভিতর হইতে বাহির যাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া জলে নামিয়া দুইটি কলসী, জলে ডুবাইয়া লইল।

তাহারা অতিকষ্টে পাড় বাহিয়া উঠিয়া গাছের আড়ালে অতি সন্তর্পণে পলায়ন করিতেছিল, সহসা পশ্চাৎ হইতে রঘুবীরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয়ে ভাবনায় তাহারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। রঘুবীর কোনও কথা না বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের মাটির কলসী দুইটা কাড়িয়া লইয়া জলটুকু মাটিতে-ঢালিয়া দিল। তাহার পর, তাহাদের মধ্যে যে মেয়েটা দেখিতে একটুখানি ভাল, রঘুবীর তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, চল, কাছারিমে চল্! ইহার বিচার হোবে। চল্!—এই বলিয়া ধাক্কা দিয়া ঝোঁপের দিকে তাহাকে আরও খানিকটা ঠেলিয়া লইয়া গেল।

পরেশের যেমন স্বভাব, একা একা মাঠের উপর পরেশ তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রঘুবীরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে একবার চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইল—

কে একটা মেয়ে যেন অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, ওকে ছেড়ে দাও পাঁড়েজি, আর আমরা কখনও আসব না!

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে এবং গাছ পালার আড়ালে ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। পরেশ দ্রুতপদে পুকুরের উপর উঠিয়া আসিয়া দেখিল, রঘুবীর একটা মেয়েকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আর একজন বৃথাই তাহার মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে। মাটির কলসী দুইটা পরেশের পায়ে ঠেকিতেই সে বুঝিতে পারিল, পুকুরে জল লইতে আসিয়াই ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়াছে। পরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না! বলিল, আজকার মত ওদের ছেড়ে দাও রঘুবীর।

অন্য কাহারও দিকে রঘুবীরের এতক্ষণ লক্ষ্য ছিল না। এবার মুখ ফিরাইয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, কোন্ হ্যায় তোম্ ?

—আমি পরেশ। ছেড়ে দাও না রঘুবীর।

রঘুবীর তাহাকেই খুঁজিতেছিল। অত্যন্ত রুষ্ট হইলেও, মেয়েটার একটা হাত ছাড়িয়া দিয়া রঘুবীর বলিল, হামি কিসকা হুকুমে ছোড়ি দিবে পারিশবাবু ? তা, হ্যাঁ, লেকিন তুঁহু যব্ বাবুকা পাশ যানে সাকে, তো হামি ছোড়তে পারি।

কথাটা পরেশ বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। বলিল বুঝতে পারলুম না, কি বল্ছো।

রঘুবীর এইবার খাঁটি বাংলায় তাহাকে বুঝাইয়া দিল, হামি বোল্সে, বাবু যব পুছবে, তবে হাম কি বোল্বে ? তুমহাকে-ভি বাবুজীকা পাশ যাতি হোবে, বোল্তি হবে, যে হ্যাঁ, ইয়ে সাচ, বাৎ আছে।

পরেশ বলিল, আচ্ছা বেশ। চল, আমি বল্ছি গিয়ে। ওদের ছেড়ে দাও।

রঘুবীর পরেশকে হাতে পাইয়া মেয়ে দুইটিকে মুক্তি দিল।

রাসবিহারী তখনও কাছারিতে আসিয়া বসে নাই। রঘুবীর পরেশকে লইয়া কাছারির অন্ধকার উঠানটা পার হইয়া গিয়া নায়েবের ঘরের চাবি খুলিয়া দিল। তাহার পর কুর্ত্তির পকেট হইতে দিয়াশালাই বাহির করিয়া পরেশের হাতে দিয়া বলিল, ঘর্‌কা ভিত্তর ইয়ে দর্‌ওয়াজাকা বিচমে একঠো ল্যান্টিন্ হ্যায় পারিশবাবু,—হামি উহিঠো জ্বালাতে পারবে না। তুঁহি জ্বালায়কে ইহাঁ থোড়া বৈঠিয়ে, হামি বাবুজীকে লিয়ে জল্‌দি আসছে। এই বলিয়া রঘুবীর অত্যন্ত ব্যস্ততার ভান দেখাইয়া, লণ্ঠন জ্বালাইয়া বসিবার জন্য পরেশকে একপ্রকার জোর করিয়াই ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিল।

পরেশ ঘরে ঢুকিয়া দিয়াশালাইএর একটি কাঠি জ্বালাইয়া চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, কোথায় লণ্ঠন রঘুবীর ?

রঘুবীর সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে কবাট দুইটা টানিয়া বাহির হইতে তাড়াতাড়ি তালা বন্ধ করিয়া দিল।

পরেশ কহিল, দরজা বন্ধ করছ কেন রঘুবীর ?

রাসবিহারীকে সংবাদ দিবার জন্য রঘুবীর তখন উঠান পার হইয়া আসিয়া বাহিরের সদর দরজাতেও তালা বন্ধ করিতেছিল।

ভিতর হইতে বন্দী পরেশের অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাওয়া গেল, রঘুবীর! রঘুবীর!

তের

কে, রঘুবীর নাকি? এ-সময় কি দরকারে এসেছিলে রঘুবীর? বলিতে বলিতে রাসবিহারী বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তক্তাপোশের উপর লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঘরের একধারে মাষ্টারমশাই এককড়িকে পড়াইতেছিলেন। কাজেই সেখানে না দাঁড়াইয়া রাসবিহারী একেবারে বৈঠকানা ঘরে আসিয়া বসিলেন।

মনিবকে এই শুভ সংবাদটা জানাইবার জন্য রঘুবীর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল,— মুখ চোখের সে এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া হাত পা নাড়িয়া কোনরকমে সে বুঝাইয়া দিল যে, পরেশকে সে এক অদ্ভুত কৌশলে 'কছওয়ারী'র মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে, এইবার যথা-কর্ত্তব্য করিলেই সবদিক ফর্সা হইয়া যায়। বরং বলেন তো একটা হাতিয়ার দিয়া নিজের গায়ে নিজেই আঘাত করিয়া সে স্বয়ং গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেরের কাছে ফৌজদারী করিয়া আসিতেও পারে। চোর বলিয়া তাহার ঘাড়ে চুরির 'চার্জ্জো' আনিয়া দিতেও পারে।

রাসবিহারী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, হুঁ। দুই-ই হতে পারে।

রঘুবীর বলিল, এইবার সাক্ষী, বাবুজী!

রাসবিহারী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সাক্ষী? আমার আবার সাক্ষীর ভাবনা রঘুবীর! কত ব্যাটা দেবে।—কিন্তু তুই সব ঠিক করতে পারবি তো?—ফাঁসিয়ে দিস্‌নে যেন!

রঘুবীর এইবার সেই আধ-আলো, আধ-অন্ধকার বারান্দাটার মধ্যেও তাহার মাথার পাগড়ীটা একবার দুই হাত দিয়া ভাল করিয়া টিপিয়া বসাইয়া লইল, এবং ক্ষুদ্রকায় হস্তি চক্ষু দুইটি যথাসম্ভব বিস্তৃত

করিয়া কহিল, এই নিয়ে মালুম, পঁচাশটি এমনি মোকার্দামা একেলা কর্‌সে।

—কে ?

—হামি। বলিয়া রঘুবীর একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

—ঠিক্ হ্যায়। বলিয়া রাসবিহারী কিছুক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। বোধকরি বা তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধির অফুরন্ত ভাণ্ডারটি হাতড়াইয়া একবার দেখিয়া লইলেন,—এই ভাগ্যহত, এই ব্যথাহত যুবকের সর্ব্বনাশের পথটি কোন্‌দিক দিয়া তিনি পরিষ্কার করিয়া দিবেন, এবং তাহার বুকের বেদনারক্ত ক্ষতমুখে কতখানি লবণেরই বা প্রয়োজন হইবে!

তাহার পর, এই দুই প্রভু ও ভৃত্যে কোথায় কি যে গোপন পরামর্শ হইয়া গেল, কেমন করিয়া যে তাঁহারা কি করিয়া ফেলিলেন,—তাহার বিন্দুবিসর্গ কেহ টের পাইল না।

রাত্রে পুলিস-থানা হইতে সরকারী সিপাই শান্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। দরজায় তিনজন সশস্ত্র সিপাই ডাকাত ধরিবার জন্য বন্দুকের ঘোড়া তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জমাদারবাবু স্বয়ং দরজার তালা খুলিলেন। ডাকাত তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নায়েবের বিছানার উপর মাথা রাখিয়াই কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পিছন হইতে অতি সাবধানে পা টিপিতে টিপিতে ডাকাতের কাছে গিয়া জমাদারবাবু তাহার পশ্চাৎ দিক হইতে টপ্ করিয়া তাহাকে এ্যারেষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

পরেশ ঘুমের ঘোরে আচম্‌কা জাগিয়া উঠিল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তাহার হাতে একগাছা লোহার হাতকড়া পড়িয়া গেল। তাহার পর, নিঃসহায়, নিরাশ্রয় সেই নির্দ্দোষী যুবককে শত সহস্র প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়া আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া, সেই আধ-জাগ্রত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় পল্লীর পথে টানিয়া আনিল।

তাহারই জনহীন পড়ো বাড়ীটার পাশ দিয়া তাহাকেই লইয়া যাইবে,—কেহ দেখিবার নাই, কেহ কাঁদিবার নাই! তবু না জানি কেন, পা দুইটা তাহার চলিতে চাহে না।—অগ্রবর্ত্তী সিপাইএর হাতে যে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল, তাহারই আলোকে পরেশ মুখ তুলিয়া একবার তাহার নিস্তব্ধ নীরব বাড়ীটার দিকে তাকাইল। খোলা দোর হাঁ হাঁ করিতেছে,—তাহার শোবার ঘরের বাহিরের জানালাটাও বুঝি খোলা রহিয়াছে! কিন্তু মানুষের একটা সম্পূর্ণ অবয়ব তো দূরের কথা, একটা চোখের চাওয়াও তাহার নজরে পড়িল না।

নিস্তব্ধ পল্লী তাহার পশ্চাতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। হঠাৎ পিছন হইতে কনেষ্টবলের একটা রুলের গুঁতা খাইয়া পড়ি-পড়ি হইয়াও সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার সোজা হইয়া জোরে সে পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু আজ সে কোথায় চলিয়াছে, কিসের অপরাধে আজ এই লোকগুলা তাহাকে বন্দীশালায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এইসব কথা ভাবিতে গিয়া তাহার শুধু এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল যে, সে ভালবাসিয়া যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে আজ বুঝি তাহারই শাস্তি ভোগ করিবার জন্য তাহার ডাক পড়িল। কিম্বা, হয়তো শাস্তি তাহার নির্জ্জন গৃহ-কারায় বহুদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, আজ তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া গেল।

পরদিন বিচারকের সম্মুখে তাহাদের ডাক পড়িল। বাদীর সাক্ষী উকিল, সকলেই উপস্থিত হইল। রঘুবীর আসিল। বিচার আরম্ভ হইল। পরেশের উকিল ছিল না, সাক্ষী ছিল না, জামিন্‌দার ছিল না, মাত্র একটা প্রস্তর মূর্ত্তির মত হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে নিজে। উকিলের প্রশ্নের উত্তরে সে একটা কথাও বলিতে পারিল না, বলিবার ইচ্ছাও ছিল না।

কোন্‌দিক দিয়া কেমন করিয়া যে ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্যাদা রক্ষা হইয়া গেল পরেশ তাহার কিছুই ঠিক-ঠাহর করিতে পারিল না।

একমাসের জন্য তাহার সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইয়া গেল। এতক্ষণে সে যেন একটুখানি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তাহার চোখের সুমুখে সমস্ত বাস্তব জগৎটা ঘুরিয়া ওলট-পালট খাইতে লাগিল।

আদালত হইতে রাসবিহারী সেদিন প্রসন্নচিত্তে ফিরিতে পারিলেন না। ভাবিয়াছিলেন, মেয়াদ আর একটু বেশীই হইবে। তাই, ফিরিবার সময় সারাপথটা শুধু এই অর্ব্বাচীন ছেলেমানুষ বিচারকের বুদ্ধিবৃত্তির অপরিপক্কতার কথাটাই তিনি ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন।

এতক্ষণ সুবিধা এবং সুযোগ কিছুই ঘটে নাই, তাই সর্ব্বপ্রথম তিনি কাছারিতে আসিয়াই রঘুবীরকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বেশ করিয়া একচোট শাসাইয়া বলিলেন, তোম্ শালা ছাতুখোরকা বাস্তে হামারা সব নষ্ট হো গিয়া। আগে তো খুব ফপর্‌দালালী মার্‌তা হ্যায়—ইয়া করেগা, উয়া করেগা, মাথা ফাটায়েগা,—তাই যদি নিজের মাথাটা একটুখানি চিড় খাইয়ে নিতে পারতিস্ হতভাগা, তা'হলে দেখতিস্—তিন-তিনটি বছর ঠেলে দেওয়া যেতে পার্‌তা হ্যায়। তখন বলে কিনা একশ টাকার কম এসব কাজ হয় না। তোম্‌কো হাম্ আর রাখেগা নাই, অন্য চাপরাশী নিয়ে আস্‌তা হ্যায়। কথাগুলা একসঙ্গে বেশ জোরে-জোরে বলিয়াই রাসবিহারী চুপ করিলেন।

অন্ততঃ শ'খানেক টাকা বক্‌শিশ পাইবে ভাবিয়া রঘুবীর নিজেই নিজের মাথা ফাটাইতে রাজী হইয়াছিল, কিন্তু রাসবিহারী তাহাকে এই কাজের জন্য মায় খরচ-খরচা গোটা দশ-পনেরো টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে রঘুবীর বাঁকিয়া বসিয়াছিল। এইবার সে হাত জোড় করিয়া কহিল, কসুর মাপ কি-জিয়ে বাবুজি, দেশমে হামরা পাঞ্চগো লড়কা, আউর, তিনটে লেড়কি—

রাসবিহারীর ভয়ানক রাগ হইয়াছিল। একটা ধমক্ দিয়া বলিলেন, আরে চোপ ছাতুখোর, তোদের আবার লড়কা-লড়কি।

ধমক খাইয়া রঘুবীর সানুনয়ে পুনশ্চ নিবেদন করিল যে, তাহাকে 'ফাটক্' হইতে একবার ফিরিয়া আসিতে দিন তাহার পর সে তাহার জীবন নাশ করিয়া দিয়া এদেশ হইতে পলায়ন করিবে এবং তাহার জন্য আর সে একটি পয়সাও দাবী করিবে না।

তুই সব কর্‌বি!—বলিয়া রাসবিহারী বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতেই কালিন্দী, গোবিন্দ, ভোঁদা, ভুতো ইত্যাদি সকলে মিলিয়া মৌমাছির মত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং কেহ কাপড় ধরিয়া, কেহ জামা ধরিয়া টানাটানি করিয়া নানাস্থরে এবং নানা ভঙ্গীতে চীৎকার করিতে লাগিল, কত্তাবাঁবাঁ গোঁ—। কেহ বলিল পয়সা দে। কেহ বলিল, সন্দেশ দে। কেহ বা কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিল, কোথায় গিয়েছিলি বল্।

রাসবিহারী তাহাদের জন্য পাঁচ-ছয়টি পাকা কলা কিনিয়া আনিয়াছিলেন। দাঁড়া, দাঁড়া, দিচ্ছি—বলিতে বলিতে ঘরের বারান্দার উপর বসিয়া পকেট হইতে অতি সাবধানে কলাগুলি বাহির করিয়া তিনি ভাগ করিয়া দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অতখানি বিলম্ব তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ছেলেদের মত হাঁ-হাঁ করিয়া যে যাহা পাইল হাতাহাতি মারামারি করিয়া কাড়িয়া লইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। ভোঁদা সকলের ছোট। কালিন্দী তাহার ভাগের কলাটা কাড়িয়া লইয়া মাত্র তাহার খোসাটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ভোঁদা সেটা রাসবিহারীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মানদা ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং ঘরে যে আরও অনেক কলা আছে এবং সেগুলা যে একমাত্র তাহারই প্রাপ্য, এই কথাটা তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিল।

মিনতি রাসবিহারীর সুমুখে তাহার হাত-পা ধুইবার জল ধরিয়া দিয়া গেল। জলটা তিনি পায়ের উপর ঢালিতে ঢালিতে মিনতিকে

শুনাইবার জন্য মানদাকে মধ্যস্থ রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ্‌লি মানদা, পরেশটার একমাস কয়েদ হয়ে গেল।

সেই ঘানি-টানা কয়েদ? বলিয়া মানদা তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিল। ভোঁদা তখন গোঁ গোঁ করিতেছিল। মানদা বলিল, এই শোন্, কাঁদিস্ নে, ওই দ্যাখ সেই 'জেহেল' নাকি হয়ে গেল শোন্! বাবারে, সেখানে আবার মানুষকে ঘানি টানায়।

রাসবিহারী বলিলেন, ঘানি টানবে না ত কি ব'সে ব'সে জামাই-আদরে খেতে দেবে নাকি? এইবার হোক্ জব্দ ব্যাটা বদ্‌মায়েস শয়তান! বলে কিনা বাড়ী দেব না, ঘর আমি ছাড়তে পারবো না। এইবার! বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ তো দ্যাখনি!

মানদা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, ওকে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, নয়?

রাসবিহারী তাঁহার হস্তধৃত জলের পাত্রটা দূরে সরাইয়া রাখিয়া কহিলেন, হ্যাঁ।

ওমা! আমরা একটা খবরও পাই নি,—উঠে দেখে আস্‌তুম যে এমন জান্‌লে!

কিন্তু এতবড় একটা সুসংবাদ একাকী হজম করা মানদার সাধ্যাতীত, তাই শুনিয়া অবধি কথাটা কাহাকেও বলিবার জন্য সে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ভোঁদাকে কোলে লইয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, মিনতি রাসবিহারীর জন্য চা তৈরী করিতেছে, কিন্তু সে বোধকরি স্বকর্ণেই ইহা শুনিয়াছে! শুনুক্, না শুনুক্, তাহার মত অরসিকের কাছে এই রস নিবেদন করিতে মানদার ইচ্ছা হইল না।

পাশের ঘরে মেঝের উপর উপুড় হইয়া হাতে মাথা গুঁজিয়া অচলা শুইয়াছিল।

যা ভোঁদা তোর মাসীর কাছে যা। বলিতে বলিতে মানদা সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, এ-ছুঁড়িকে ভূতে-টুতে পেয়েছে

বোধ হয়। ওলো অ অচলি, দিনরাত যে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোচ্ছিস্, সন্ধ্যে হয়ে গেল যে? ওঠ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেহ যে তোর কালীবর্ন হ'য়ে গেল।—এই বলিয়া মানদা তাহার হাত ধরিয়া চড় চড় করিয়া টানিয়া তুলিয়া দিল। অচলা জাগিয়াই ছিল। সকাতর দৃষ্টিতে মানদার মুখের পানে একবার তাকাইল।

মানদা ভোঁদাকে তাহার কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গতরের মাথা যে খেলি। এদিকে কি হয়েছে শুনেছিস্? সে পরেশটার কয়েদ হয়ে গেছে একমাস।

অচলা শুইয়া শুইয়া সমস্ত শুনিয়াছিল। বলিল, হলো তো আমার কি?

মানদা হাসিতে হাসিতে বলিল, তাই তো বল্‌ছিলাম এতক্ষণ, অচলি আমাদের ও-ছোঁড়াটাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারতো না।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া মানদা কহিল, তোকে একদিন ধর্‌তে এসেছিল না? এই সময় সেই কথাটা তোর বাবা যদি সায়েবকে বলে দিত, তাহ'লে বাছাধনকে একেবারে জন্মের মতন—কথাটা সে আর শেষ করিতে পাইল না। অচলা ধীরে-ধীরে উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

অভয়ার ঘর হইতে হিতলালের গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। সে ভাবিত, তাহার মত দুনিয়ায় সকলেই বোধকরি কানে একটু কম শুনে, তাই পাছে কেহ না শুনিতে পায় এই ভাবিয়া আস্তে কথা সে কোন কালেই বলিতে পারে না। সদ্য দিবা-নিদ্রা ভঙ্গের পর বোধহয় কোনও আহার্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অভয়াকে সে পরামর্শ দিতেছিল।

শুনেছিস অভয়া—বলিয়া ভোঁদাকে কোলে লইয়া মানদা তাহাদের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

অচলা উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে তাহার কঙ্কালসার

দেহটাকে টানিয়া টানিয়া সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল· না,—কিছুদূর গিয়া সিঁড়ির উপরেই বসিয়া পড়িল। যন্ত্রণায় মুখ-বিকৃতি করিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধীরে-ধীরে আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার আর বসিল না। কোন রকমে দোতালার সিঁড়িগুলা ভাঙ্গিয়া একেবারে ছাতে উঠিয়া গেল। মাগো! আর কতকাল,—আর কতকাল তাহার এই দুঃসহ কর্ম্মভোগ! জ্বালাময় বেদনার এই তীব্র দাহ আর কতদিন তাহাকে এমনি সঙ্গোপনে পুড়াইয়া মারিবে! দিনে দিনে এ যে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে! এ কি হইল তার! কাহাকে বলিবে,—কেই বা শুনিবে?···

সেখান হইতে পরেশের পুরাতন ভাঙা বাড়ীটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। অচলা মনের ভুলে একবার সেইদিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। অনতিদূরে শুষ্ক নদীর বালিগুলা বাতাসে উড়িয়া অস্তসূর্য্যের রাঙ্গা আলোয় চিক্‌-মিক্‌ করিতেছে। তাহারই উপরে, পথের ধারে ওই সেই বড় তেঁতুল গাছটা!······

অচলা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ছাদের সেই উত্তপ্ত শানের উপর আবার সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। নির্জ্জনে কিয়ৎক্ষণ কাঁদিল; তাহার পর মিনিট কয়েকের জন্য একটুখানি শান্ত হইলে সহসা তাহার চুলের উপর কাহার যেন হাত পড়িতেই অচলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, মিনতি কোন্‌ সময় তাহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার কান্না বুঝি সে দেখিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া অচলা একটুখানি হাসিল। কিন্তু সে শুষ্ক ম্লান হাসি তাহার সজল চক্ষু দুটাকে প্রতারিত করিতে পারিল না।

মিনতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তোর মত স্বামী-পাগলী মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলুম অচি! এত ভালবাসা তুই কোথায় পেলি বল্‌ত? না অচি, আর পারি না বাপু, কাল নলিনীকে আমি নিজেই একখানা চিঠি লিখবো, দেখি কেমন না আসে।

স্বামীর কথা শুনিয়া অচলার সর্ব্বাঙ্গ যেন রি-রি করিয়া উঠিল। বলিল, খবরদার বল্‌ছি, তাহ'লে আমার মরা-মুখ দেখবে। আমি বিষ খেয়ে মরব।

সবাই মরে। আমিও মরতে চেয়েছিলুম একদিন। নে, ওঠ। চা হয়ত' ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল এতক্ষণ। এই বলিয়া মিনতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।

চৌদ্দ

পাছে কেহ কিছু টের পায়,—এই ভয়ে অচলা আজকাল কাহারও সঙ্গে তেমন মেলা-মেশা করে না। অধিকাংশ সময় যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এজন্য মিনতি তাহাকে অনেক কথা বলে। মানদা, অভয়াও কিছু কম বলে না, কিন্তু অচলা কাহারও কথা শুনিতে চায় না। বলিতে গেলেই ঝগড়া করে,—কাঁদে,—না খাইয়া পড়িয়া থাকে। এই লইয়া মিনতির সহিত মাঝে মাঝে তাহার কথা-কওয়া বন্ধ হয়। আবার থাকিতে না পারিলেই, যে-হোক্ একজন আগে কথা কহিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া লয়।

গত দুইদিন ধরিয়া মিনতি ও অচলা, কেহ কাহারও সহিত একটা কথাও কহে নাই। দু'জনেরই অভিমান হইয়াছিল।

অচলা যে জিনিসটাকে লুকাইয়া এড়াইয়া চলিতে চায়, মিনতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন সেইখানেই আসিয়া পড়ে।

মিনতি আবার সেদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বল্ অচি কিছু হয়েছে নিশ্চয়। কি হয়েছে বল্ না লক্ষ্মীটি!

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—সত্যি বল্‌ছি, আমার কিছু হয়নি।

কিন্তু এই মিথ্যা কথাটা সে যে কত অসহায়,—কত নিরুপায় হইয়া কত কষ্টে উচ্চারণ করিল, তা সে-ই জানে।

—তবে কি মন কেমন করে?

—কার জন্যে?

—নলিনীর জন্যে?

কথাটা শুনিয়া অচলা সেই যে মিনতির কাছ হইতে রাগ করিয়া

উঠিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল না। মিনতিও রাগ করিয়া তাহাকে আর ডাকিল না। সেইদিন হইতে দু'জনেই দু'জনকে কেমন যেন এড়াইয়া চলিতেছে!

দু'দিন পরে এই বিবাদ মিটিল। মিনতি থাকিতে পারিল না। নিজেই তাহাকে জোর করিয়া তাহার ঘরে টানিয়া আনিয়া বসাইল।

অচলা হাসিয়া বলিল, ডাকলে কেন? কথা যে কইবে না বলেছিলে?

আমি যে থাকতে পারিনা ভাই!—বলিয়া মিনতি আবার তাহাকে আগের মত কাছে টানিয়া বলিতে লাগিল, আমি ভুল বুঝেছিলুম অচি, শুধু সেই কথাটাই আজ দু'দিন ধ'রে ভেবেছি।

অচলা মুখ তুলিয়া সকরুণ নয়নে একবার মিনতির মুখের পানে তাকাইল।

মিনতি বলিল, আমি ঠিক এই ভাবনাই ভেবেছিলুম।

ভয়ে-ভাবনায় অচলার মুখখানি সহসা এতটুকু হইয়া গেল। একটুখানি সরিয়া গিয়া বলিল, কি ভাবনা?

—তুই এমনি হয়ে যাবি, সেই ভাবনা।

অচলা পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি হয়েছি আমি?

—মেয়েদের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেলে যা হয়। তবে, মাত্র এইটুকু সান্ত্বনা যে, এ-শুধু তুই আর আমি নই অচলা, এমনি ব্যর্থতা বাংলার ঘরে ঘরে।

—বুঝতে পারলুম না; ভালো ক'রে বলো।

মিনতি বলিল, বুঝতে যদি না পেরেচিস্ ত' সে একরকম ভালই। কিন্তু মেয়ে হ'য়ে জন্মে, তুই যে ভালোবাসা বুঝতে পারিস নি, সেকথা আমি কেমন ক'রে বিশ্বাস করি বল্?

অচলা এতক্ষণ যে সন্দেহ করিতেছিল, তাহা নয় জানিয়া, এইবার সে যেন একটুখানি আশ্বস্ত হইল। বলিল, ভালবাসা নাই বা পেলুম!

—ম'রে যাবি।

—ভালোই হবে।

—না, না, ভালো হবে না অচলা, মন্দ বই ভালো কিছুই হবে না।

কথাগুলি বলিয়া মিনতি কেমন যেন একটুখানি অপ্রতিভ হইয়াই কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, পরে কহিল, তোর বাবার সঙ্গে আজ দুদিন আমার কথাবার্ত্তা বন্ধ।

—কেন?

—আর বলিস্‌নে অচলা, পরেশকে সে বিনাদোষে জেলে পাঠিয়েছে। বেচারীর কোনও দোষ ছিল না।

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য আগ্রহ হইলেও অচলা হেঁটমুখে মৌন হইয়াই বসিয়া রহিল।

মিনতি আবার বলিল, একটা নির্দ্দোষী লোককে জোর ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে চোর ব'লে চালান দেওয়া,—ছি, ছি,! মানুষের এই নীচতা দেখলে আমার অসহ্য হ'য়ে ওঠে। আমি ভিতরের খবর এত-সব জানতুম না, পরশু তোর বাবা আমায় বললে।

অচলাও এমনি একটা কিছু ভাবিয়াছিল। পরেশ যে কোনও ছোট কাজ করিয়া জেলে যাইবে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না,—তাহা সে জানিত। গ্রাম হইতে পরেশকে হাতকড়া দিয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার জেল হইয়াছে, এসব কথা শুনিয়া অচলার দুঃখ হইয়াছিল, নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তাহার কথা অনেকবার অনেক রকমে সে ভাবিয়াছে। শাস্ত্র ও সংস্কারের অনুশাসন তাহাকে বাধা দিয়েছে,—স্বামী ছাড়া অন্য কাহারও কথা ভাবিতে নাই, অন্য কোনও পর-পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতে নাই! হয়ত সে তাহাই করিত, হয়ত সে তাহার কথা এমন করিয়া ভাবিত না, স্বামী যদি তাহার সমস্ত অতীতকে আড়াল করিয়া, পুরুষের অন্তর-বাহিরের অপরূপ মাধুর্য্য দিয়া তাহাকে জয় করিয়া লইত। কিন্তু

তাহা ত হইল না! আর কোনদিন হইবে বলিয়াও ত আশা হয় না। ভাঙা কাঁচ হয়ত জোড়া লাগে, কিন্তু ভাঙা বুক জোড়া লাগাইবার কোন বৈজ্ঞানিক বিধান জগতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ত তাহার বিশ্বাস হয় না! সে ত তাহাকে ভালবাসে নাই, ভালবাসিয়া আঘাত দিয়াছে,—আহত হইয়াছে,—এ যে ভুলিবার নয়, এ যে কাহারও কাছে খুলিবারও নয়!—

অচলা ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছিল, মিনতি তাহার হাত ধরিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, তুই যদি এমনি দূরে-দূরে ঘুরে' বেড়াস অচলা, তোকে যদি কাছে না পাই, তা'হলে আমি—মিনতি আর কিছু বলিতে পারিল না, অচলার দুইটি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

পনর

গ্রামে একজন বুড়া মুসলমান বাস করে, নাম—আলিজান; গায়ের রং ফর্সা, এককালে দেখিতে বেশ লম্বা-চওড়া সুপুরুষ ছিল,—বার্দ্ধক্যের ভারে আজকাল তাহার সে অনমিত দেহ নুইয়া পড়িয়াছে লাঠি ধরিয়া চলিতে হয়। বড় বড় পাকা দাড়ি,—কোমর পর্য্যন্ত লম্বা। তাহার তিনটি ছেলে,—কিন্তু তিনজনেই এমনি গুণবান, যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কি-একটা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এই বুড়ো বাপকে তাহারা জেলে পাঠাইয়াছিল। জেল হইতে ফিরিয়া আলিজানের যে দুর্গতি হইল তাহা বলিবার নয়। ছেলে তিনটা চামড়ার কারবার করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। কিন্তু বৃদ্ধ পিতাকে তাহারা আর খাইতে দেয় না, এমন কি, ঘরে থাকিবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত তাহার আর নাই। আলিজান সম্প্রতি গ্রামের একপ্রান্তে একটি মাটির ছোট কুঁড়ে বাঁধিয়া তাহাতে বাস করে। প্রথমে সে গ্রামের লোকের ছাতা, কোর্ত্তা, এই সব সেলাই করিয়া কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। এখন আবার তাহাও পারে না, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সূঁচে সূতা পরাইতেই এখন তাহার আধঘণ্টা লাগে। কাজেই বারুইপুর হইতে তিন চার টাকার চুড়ি, আয়না, সাবান, ফিতে এইসব জিনিস কিনিয়া আনিয়া গ্রামের দুয়ারে-দুয়ারে সে ফিরি করিয়া বেড়ায় তাহাতেই কোনরকমে তাহাকে চালাইতে হয়। গ্রামের ছেলেমেয়েগুলো এই বুড়াকে দেখিতে পাইলেই চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসে। কেহ চোখের সুমুখে হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ভেংচি কাটিয়া বক্ দেখায়, আবার কখনও বা দু'চারজন একত্রে মিশিয়া সমস্বরে বলিতে থাকে,—

—আলিজান আল্লা বোলে,
দাঁড়িতে বাদুড় ঝোলে।

আলিজান হাসিতে হাসিতে লাঠি তুলিয়া তাহাদের মারিতে ছোটে, কখনও বা তাহাদের ডাকিয়া বলে, আয় তবে শোন্, বাদ্‌শা-জাদীর গল্প বলি। ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসে। খাওয়া-পরা ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধ তাহাদের গল্প শোনায়।

সেদিন বৈকালে আলিজান নায়েবের বাড়ীর পাশ দিয়া হাঁটিতেছিল। এইখানে আসিয়া তাহার একটুখানি ভয় হয়। কারণ কালিন্দী ইত্যাদি এখানে যে-সব ছেলেগুলি আছে, গল্প শুনিতে তাহারা ভালবাসে না—বিনা কারণেই দূর হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া কিম্বা গায়ে থুথু দিয়া তাহারা ছুটিয়া পালাইয়া যায়।

সহসা তাহার সম্মুখে অচলাকে দেখিতে পাইয়া, আলিজান একবার মুখ তুলিয়া দাড়ি নাড়িয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল কে মা তুমি?

অচলাও ছেলেবেলায় এই আলিজানের কাছে অনেক বাদশাজাদী, শহরজাদী, দিনারজাদির অনেক গল্প শুনিয়াছে, এই সেদিন পর্য্যন্ত তাহার কাছে চুড়ি পরিয়াছে। বলিল, আমি, অচলা।

আলিজান থমকিয়া দাঁড়াইল। এই রাসু নায়েবের মেয়েটিকে চিনিতে না পারা যে তাহার অন্যায় হইয়াছে, এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঘাড় নাড়িয়া তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি অচলার মুখের পানে তুলিয়া কহিল, চোখে ত' আর ভাল নজর চলে না মা, তাই চিন্‌তে পারি না, আমায় চারটি চাল দিবি মা? এইগুলি পেয়েছি আর 'একমুঠো হলেই হবে। এই বলিয়া বৃদ্ধ তাহার শতছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ডের একপ্রান্তে-বাঁধা চালগুলি তুলিয়া দেখাইল।

—এসো। বলিয়া অচলা পুনরায় বাড়ীর দিকে ফিরিয়া কহিল, তুমি আর কি চুড়ি বিক্রি কর না? ভিক্ষে করছো যে?

আলিজান লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করিয়া তাহার পশ্চাতে চলিতে চলিতে বলিল, না মা, ভিক্ষে কেন কর্‌ব অচলা? সেই ময়না-বিবির গল্পটা কত বড় তা তো জানো, সন্ধ্যেয় বল্‌তে বস্‌লে রাত ভোর হয়ে যায়;

এক পহর বেলা থেকে সেই গল্পটাই আজ বল্‌তে বসেছিলাম, তাই আর বিক্রি-সিক্রি কিছুই হলো না।

অচলা আবার প্রশ্ন করিল, তোমার ছেলেরা কি এখনও তেমনি আছে? কেউ তোমায় ডেকে একদিন খাওয়ায় না?

বৃদ্ধের মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাহ'লে আর ভাবনা কি মা? বুড়ো বাপকে যারা জেলে দিতে পারে—গভীর দুঃখে কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না। বুকের ভিতরেই কোথায় যেন আট্‌কাইয়া রহিল।

আলিজান জেলে গিয়াছিল, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহা জানিত। অচলাও যে জানিত না, এমন নয়; তবে, বেশ মনে ছিল না। আজ তাহার জেলে যাওয়ার কথাটা তাহারই মুখে শুনিয়া হঠাৎ অচলার মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা যে সে কেমন করিয়া জিজ্ঞসা করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না,—অথচ, কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্খা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। অচলা একবার চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়া লইল, কেহ কোথাও আসিতেছে কিনা; পরে, গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া কহিল, আচ্ছা জেলখানায় মানুষকে খুব কষ্ট দেয়, নয়? ঘানি টানায়?

বৃদ্ধ বোধ করি এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে তাহার ছেলেদের অসদ্ব্যবহারের কথা,—তিন-তিনটা যোগ্যপুত্র থাকিতে আজ তাহার এই পরিণত বার্দ্ধক্যেও অশেষ প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার কথাই ভাবিতেছিল; অচলার প্রশ্ন সে শুনিতে পায় নাই। হঠাৎ সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া কহিল, উঁ—কি বল্‌লে মা?

কথাটা অচলা আবার বলিতে যাইতেছিল,—এমন সময় দেখিল সেই পথ দিয়া নারাণপুরের-বৌ কলসী-কাঁকে পুকুরে বোধকরি জল আনিতে যাইতেছে। অচলার আর কিছুই বলা হইল না। বলিল,—

না, কিছু নয়। তুমি এইখানে দাঁড়াও, চাল আমি এনে' দিচ্ছি।

হ্যাঁ মা, আমি এইখানেই বসি, আর এগোব না। কালিন্দী-ভুতু-টুতুরা দেখতে পেলে আমায় নাস্তানাবুদ করে তুলবে। এই বলিয়া রাসবিহারীর কালী-মন্দিরের পাশে দেওয়ালের ছায়ায় গিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া বসিল।

ঘরে গিয়া অচলা বলিল, একমুঠো চাল দে না দিদি!

অভয়া আজ-কাল অচলার উপর খড়্গ-হস্ত হইয়াই থাকিত; ট্যাক্ ট্যাক্ করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল কি হবে লো সর্ব্বনাশী, চাল কি হবে?

অচলা বলিল, একজনকে দেবো। দে না দিদি!

অভয়া মারমূর্ত্তি হইয়া কহিল, অত ধম্মতে কাজ নাই তোর,—ধম্ম-ওয়ালী! যা যা, দাতব্যি করবার চাল নাই আমার। বেরো।

দিগম্বর কালিন্দীর কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। চালের কথা শুনিয়া অচলার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া সজোরে টানিতে টানিতে সে প্রশ্ন করিল, পাকা খেজুর বিক্রি করতে এসেছে, নয় অচলি? সেই জন্যে চাল চাইছিস?

অচলা তাহার হাত হইতে কাপড়টা টানিয়া লইয়া বলিল, না রে না, খেজুর আসেনি, ছাড়্। এই বলিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ-মুখে সেখান হইতে সে চলিয়া গেল।

খেজুর যে বিক্রি করিতে আসে নাই, কালিন্দী সে কথা কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। অভয়ার কাছে গিয়া সুর করিয়া করিয়া কাঁদিতে লাগিল, দেঁ শালী চাঁল দেঁ, খেঁজুঁর খা—ব। দেঁ শাঁলী হারাম জা—দী।

অভয়া বলিল, কোথা গেলি, অচলি! খেজুর এসেছে তো না-হয় নিয়ে যা চারটি চাল।

সিঁড়ি দিয়া অচলা উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, বলিল, না, চাই না।

উপরের ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মিনতি বলিল, কি চাই নে অচি?

—কিছু না। আমায় চারটি পয়সা দেবে?

—দেব আবার কি? নে না আলমারি খুলে।

আলমারি হইতে চারিটি পয়সা লইয়া অচলা পুনরায় নীচে নামিয়া যাইতেছিল, মিনতি বলিল, শীগ্‌গীর ফিরে আয় অচি, তোর সঙ্গে কথা আছে।

—আসি। বলিয়া অচলা চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি বল্‌ছিলে?

মিনতি কি-একটা বাংলা উপন্যাস পড়িতেছিল, বইখানা বন্ধ করিয়া বালিশের তলায় রাখিয়া দিয়া বলিল, পয়সা কি হবে রে?

—আলিজানকে দিলুম।

—কে? সেই চুড়ি-ওয়ালা আলিজান?

—হ্যাঁ।

ও—বলিয়া মিনতি সেখান হইতে উঠিয়া বলিল, চল্ না অচি, আমরা ছাতে ব'সে গল্প করিগে চল্, আবার সারাদিন তেমনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্, তুই বড় দুষ্টু!

—অচলা বলিল, চলো।

দুজনেই ছাতে উঠিয়া গেল।

মিনতি বলিল, ইস্! এখনও ছাতে রোদ রয়েছে। আয়, এই দেয়ালটার ছায়ায় আমরা বসি।

দুজনে পাশাপাশি বসিলে মিনতি বোধ করি কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভাই, বৃষ্টি কি এ-বছরে হবে না? বর্ষাকালেও যদি বৃষ্টি না হয়, মানুষ তো তাহলে ম'রে যাবে।

সম্মুখে ছোট দেওয়ালটার ফাঁকে হঠাৎ পরেশের বাড়ীর দিকে

মিনতির নজর পড়িল। আঙুল বাড়াইয়া বলিল, ওইটা পরেশের বাড়ী, না রে অচি ?

ঘাড় নাড়িয়া অচলা বলিল, হাঁ।

সেও এতক্ষণ এই বাড়ীটার দিকেই তাকাইয়াছিল।

মিনতি তাহা লক্ষ্য করিল। এবং কিয়ৎক্ষণ নীরবে নতমুখে কি যেন চিন্তা করিয়া সস্নেহে অচলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল, পরেশকে তোর ভাল লাগে, না রে অচি ?

—যাও! বলিয়া অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

মিনতি দুইহাত দিয়া তাহার মুখখানি পুনরায় নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল, কেন, যাও কেন? সে কথা মুখে আনলেও পাপ হয়, না।

অচলা এবার যেন মন্ত্র-মুগ্ধের মত মিনতির সেই অদ্ভুত মুখের পানে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময় নীচ হইতে মানদার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল, তোর বাবা,কি জন্মে ডাকছে অচলি, শুনে যা।

অচলা ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ডাকছে শুনে আসি। বাবা এসেছে বোধ হয়। তুমি যাবে না ?

—না, তুই যা। বলিয়া মিনতি উদাস গম্ভীর দৃষ্টিতে ধূসর আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে গিয়া অচলা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিল না যে, সে কেমন করিয়া এতক্ষণ তাহার সর্ব্বনাশা ব্যাধির এই প্রানান্তকর বেদনাটা ভুলিয়া গিয়াছিল।

অতি কষ্টে নীচে নামিয়া অচলা বলিল, বাবা কোথায় মানদা ? কি বলছিল ?

মানদা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, বাবার নাম না কর্‌লে তুই কি আর ওর কাছ থেকে নামতিস্ অচলি ? হাঁ ছাখ্ অভয়া কি বলছে শোন্

অভয়া বলিল, দু-কলসী জল এনে দে অচলি, ঘরে এক ফোঁটা জল নেই।

অচলা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাবা রে বাবা! আমি পারব না জল আনতে। আমার শরীর ভাল নেই।

অভয়া বলিয়া উঠিল, শরীরে তোর আবার কি হলো গতর-খাগী! দিব্যি তো দুবেলা ভাত মারছিস্। যা বলছি অচলি, এই নে কলসী নে।

যন্ত্রনা এত বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, অচলার সে সময় কথা কহিতেও ভাল লাগিতেছিল না, কোথাও দুদণ্ড চুপ করিয়া শুইতে পারিলেই যেন বাঁচে।

আমি পারব না। মানদা আনুক গে। বলিয়া অচলা চলিয়া যাইতেছিল। অভয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, খোঁটা দিয়ে কথা দ্যাখ্ মেয়ের! এ সব ওই ওঁর কাছে শিখে আসছে দিন-দিন। আজ একাদশীর উপোস-গায়ে মানদা জল আনবে না, বলছি ভালয়-ভালয় যা অচলি, নইলে এই পিতলের ঘড়া তোর মাথায় যদি না ভাঙ্গি ত আমার নাম মিথ্যে!

অচলার জেদ চড়িয়া গেল। বলিল, যাব না—যেতে পারব না।

তবে এই দ্যাখ্। বলিয়া পিতলের ঘড়াটা লইয়া অভয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া সত্য-সত্যই তাহার মাথার উপর ঘড়াটা ঠাঁই করিয়া ঠুকিয়া দিল এবং ঘাড় ধরিয়া তাহাকে এত জোরে লাথি মারিয়া ঠেলিয়া দিল যে, অতিকষ্টে জানালার শিক ধরিয়া অচলা নিজেকে সামলাইয়া লইল। দরজার কবাটে লাগিলে মাথাটা তাহার গুঁড়া হইয়া যাইত।

মানদা বলিল, দে অভয়া, ঘড়াটা দে, হোক্‌গে উপোস-গা, দে আমিই আনি। বড় দিদির মুখের উপর অমন পট্-পট্ করে জবাব! মা গো মা, হাজার হোক্ বড় দিদি তো! বয়সেও যে তোর মায়ের যুগ্যি লো পোড়ারমুখী।

অভয়া বলিল, দিদির খাতির ত' সবই করে। আমি উল্টে বোন্‌ বোন্‌ করে সারা হই।

তা কি আর আমি দেখছিনে অভয়া।—এই যে কাজ করছ না বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘর করতে গেলে খাটিয়ে-খাটিয়ে কোমরের মাজা যখন ভেঙে দেবে, তখন বুঝ্‌বি মজা। ভাগ্যিস্‌, সোয়ামী বড়লোক হয়নি, তাহ'লে ত ও হাতে মাথা কাট্‌তো।—এই সব বলিতে বলিতে মানদা কলসীটা তাহার কাঁখে তুলিয়া লইল।

কথাগুলা অচলা সবই শুনিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোন কিছু বলিবার ক্ষমতা তখন তাহার ছিল না। ঘরের এক কোণে গিয়া সে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখে জানালার বাহিরে তখন নিদাঘ-তপ্ত দিনের ধরিত্রী সাঁঝের আলোয় শান্ত-সুন্দর হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিম দিগন্ত হইতে অস্ত-সূর্য্যের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় আকাশ রঙিয়াছে, বাতাস রঙিয়াছে,—মাটির কোলে উত্তপ্ত দিনের বিশুষ্ক গাছের পাতায় পাতায় সোনার আলো, আবার যেন নব-জীবনের রঙের খেলায় মাতিয়া উঠিল।

অচলা ভাবিতেছিল এই ত' জীবন। এমন করিয়া তাহার আর কতদিন চলিবে···

ষোল

ঠিক কবে যে পরেশের জেল হইয়াছে, অচলার মনে ছিল না। তাহার বাবা যে ঠিক কোন্ তারিখে আদালত হইতে পরমানন্দে এই সংবাদটি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাও সে ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না। আন্দাজি সেটাকে বুধবার ধরিয়া আঙুল গুনিয়া অচলা হিসাব করিয়া দেখিল যে, আর হয়ত চারিদিন পরে পরেশ খালাস পাইবে।

কিন্তু তাহার গণনায় ভুল হইয়াছিল। কারণ তাহার দু'দিন পরেই পরেশ মুক্তি পাইল।

একমাস কারাবাসের পর, লম্বা রুক্ষ চুল-দাড়ি, মলিন বস্ত্র এবং তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ লইয়া সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া পরেশ গ্রামে ফিরিল।

গ্রামের পথ-ঘাট অন্ধকার। তবু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পল্লীপথ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, ঘরে-ঘরে দোর বন্ধ হইল, ততক্ষণ সে গ্রামের প্রান্তে একটা বাগানের ধারে বসিয়া রহিল। তাহার পর, অনেক ভাবিয়া অনেক কষ্টে, অনেক আনন্দে, পরেশ তাহার বসতবাটীর অন্ধকার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সদর দরজা তেম্‌নি খোলা। সমস্ত বাড়ীটা, আগেকার চেয়ে এখন যেন আরও বেশী খাঁ-খাঁ করিতেছে। যদি আজ অন্ততঃ একটা লোকও থাকিত·· কিন্তু যাক্, গত ক'টি মাস ধরিয়া সেকথা সে অনেক ভাবিয়াছে, আর পারে না। ভিতরের ঘরের দরজা তালাবন্ধ ছিল, কিন্তু একমাস পূর্ব্বে চাবিটা কোথায় ফেলিয়াছে তাহা ঠিক স্মরণ হয় না। বারান্দার উপর উঠিয়া দাঁড়াইতেই, কড়িকাঠের উপর হইতে একটা টিক্‌টিকি টিক্-টিক্ করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। নিশাচর একটা পাখী বোধকরি পেয়ারা

গাছটার ডালে বসিয়াছিল, পায়ের শব্দ পাইয়া উড়িয়া পালাইল। পাখীটার পাখার শব্দে সে আচমকা সেইদিকে তাকাইল, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে, কিছুই দেখা গেল না। এত অন্ধকার, যে নিজের হাতখানা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আকাশে একটা নক্ষত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

বন্ধ ঘরের তালাটা ধরিয়া সে বার-কতক্ টানাটানি করিল কিন্তু খোলা কিছুতেই গেল না।—ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাও পারিল না। কাহার উপর অভিমান করিয়া সে যেন একবার এদিক-ওদিক তাকাইল, তাহার পর কবাটের গায়ে সজোরে তুইবার পদাঘাত করিয়াও দেখিল, কিন্তু তাহারই ঘরের শক্ত দরজা তাহাকেই যখন প্রত্যাখ্যান করিল, তখন আর অন্য কোন উপায় রহিল না। অগত্যা বারান্দার একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া তাহাকে বসিতে হইল। এত-দিনের কারাবাসের পর বন্দী আজ মুক্তি পাইয়া ঘরে ফিরিয়াছে,—কেহ কথাটি পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিবার নাই! ইহার চেয়ে হয়ত জেলখানাই তার ছিল ভাল! কিন্তু তাহাতে তুনিয়ার কি আসে যায়···

অত্যন্ত গরমে চারিদিক গুমোট করিয়া আছে। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। দূর হইতে ভিন্ন-গ্রামের কয়েকটা কুকুরের গলার আওয়াজ শুনিয়া, বাউরি ও মুচি-পাড়ার কুকুরগুলা অনেকক্ষণ চেঁচাইতেছিল।—এই মাত্র তাহারাও চুপ করিল। কোথাও কোনও শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না। চারিদিক নিস্তব্ধ। পরেশ একবার মেঝের উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। কিসের জন্য সে আজ গ্রামে ফিরিয়াছে,—কিসের আশায়?···এই কথাটা সে অনেকবার ভাবিয়াছে, আজও ভাবিল। গ্রামে না ফিরিবার চেষ্টাও সে কম করে নাই, কিন্তু কি জানি কেন, ফিরিয়া তাহাকে আসিতেই হয়। যে আশায় সে ফেরে, সে-আশা যে সুদূর-পরাহত তাহা সে জানে। ঘর সে যে কোনদিন বাঁধিবে না, তাহাও সুনিশ্চিত, তথাপি

কিসের মায়া যে তাহাকে বারে-বারে টানিয়া আনে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ কি ভাবিয়া সে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এখনই যাইবে। এই নীরব নিশুতি রাতের অন্ধকারে সে যদি আজ পথের ডাকে গ্রাম ছাড়িয়া, এই ঘর ছাড়িয়া, অনন্ত বাসনা, অতৃপ্ত ক্ষুধা সঙ্গে লইয়া, কোন্ দূরে—বহুদূরে চলিয়া যায়,—তাহাতে কাহার কি ক্ষতি!···কিছুদিন পূর্ব্বে সে ভাবিয়াছিল, না থাক্ তাহার আত্মীয়, না থাক স্বজন,—একজন আছে, যাহাকে লইয়া সে তাহার এই বহুকালের শূন্য ঘর পূর্ণ করিয়া তুলিবে, এই মাটি আঁক্ড়াইয়া সে আমরণ পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার সেই কৈশোরের ফুল যৌবনেই মরিয়া ঝরিয়া পড়িল,—সেই মহামূল্য মাটির দাম আজ আর তাহার কাছে এক কাণাকড়িও রহিল না। পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। উন্মাদের মত সে অন্ধকার পথের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু বেশী দূরে তাহার যাওয়া হইল না। নায়েবের কাছারী বামদিকে পড়িয়া রহিল। নরেন মিত্তিরের বাড়ী, ঘোষালদের চণ্ডী-মণ্ডপ পার হইয়া অচলাদের বাড়ীর কাছে গিয়া পৌঁছিতেই আবার কিসের দুর্ব্বলতা যেন অতর্কিতে তাহার সমস্ত শক্তিকে আক্রমণ করিল, আবার তাহার পা দুইটা যেন পিছন পানে ফিরিতে চাহিল। বারে-বারে সে যেমন করিয়া গিয়াছে আর ফিরিয়া আসিয়াছে, যেমন করিয়া প্রতিমূহূর্ত্তে সে আত্মহত্যার অকাল মৃত্যুকে জীবনের পানে টানিয়াছে,—আজও ঠিক্ তেমনি করিয়াই সে আবার ফিরিয়া আসিল। বিদায়-বেলায় একবারটি সে তাহাকে চোখের দেখা দেখিয়া যাইবে। কোনও কথা বলিবে না, কোনও কথা শুনিবে না, কেহ কিছু জানিবে না, কেহ কিছু বুঝিবেও না! তারপর, জীবনের যবনিকা টানিয়া দিবে। চিরদিনের মত এ-পথে কাঁটা দিয়া সে সরিয়া পড়িবে,—রাহুর ক্ষুধা লইয়া ভবিষ্যতে সে আর কোনদিন চাঁদের সর্ব্বনাশ করিবে না···

মাতালের মত টলিতে টলিতে পরেশ পুনরায় তার সেই জনহীন শূন্য গৃহের বারান্দায় উঠিয়া বসিল। শুধু তাহাকে বাদ দিয়া গ্রামের চৌকিদার প্রতি ঘরের দোরে-দোরে হাঁক্ দিয়া জাগাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু প্রিয়ার কোলে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় যাহারা নিদ্রামগ্ন, তাহাদের সে শান্তিময় পরিপূর্ণ বিশ্রামের দাবী কাড়িয়া লওয়া বড় সহজ কথা নয়। চৌকিদারের হাঁকে তাঁহারা সতর্ক হইল কিনা কে জানে। কিন্তু ভুলিয়াও যাহাকে একবার কেহ ডাক দিয়া গেল না, সতর্ক হইবার কোনও প্রয়োজনই যাহার নাই,—সে-ই শুধু অতিমাত্রায় সতর্ক হইয়া বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়া, অন্ধ-তমসাবৃতা ধরণীর দিকে চাহিয়া প্রভাতের আশায় প্রহরের পর প্রহর গণিতে লাগিল।

আকাশে বোধকরি মেঘ জমিতেছিল। কিছু পূর্ব্বে কয়েকটা তারাও উঠিয়াছিল। সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘের তলায় তারাগুলা ডুবিয়া গেল। তাহার পর, রাত্রির শেষ প্রহরের পরিশ্রান্ত পরেশ একটু-খানি তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; সহসা পাখীর কলরবে তাহার চেতনা ফিরিতেই তন্দ্রালস তাহার চক্ষু দুটি মেলিয়া দেখিল, তাহারই সম্মুখে পূর্ব্ব-দিক্-চক্রবালের অন্ধকার ফাটিয়া একটুখানি আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে,—অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত একটি রক্তপদ্মের অঞ্জলির মত প্রভাত-আলোর এক ঝলক্ স্নিগ্ধ রশ্মি কে যেন এই নিদ্রিত বসুন্ধরার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

কিন্তু এত সুন্দর এই প্রভাত, এত স্নিগ্ধ এই মাটি, এত মিষ্টি এই ভোরের বাতাস, এ-সব দেখাইয়া এই অনির্দ্দেশ্য মরণ-পথ-যাত্রীকে প্রবঞ্চিত করিবার কোনও অধিকার আজ তোমার নাই!—কাহার উদ্দেশ্যে যেন মনে-মনে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে পরেশ চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গ্রামের কেহ জাগিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই এই পথটুকু সে তাড়াতাড়ি পার হইয়া গিয়া নদীর পথে সেই বাঁশগাছের

তলায় বসিয়া কাহার আসার আশায় পথপানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল।

গ্রামের কয়েকজন কুলি মজুর ভিন্ন গ্রামে খাটিবার জন্য সেই পথ দিয়া পার হইয়া গেল। একজন বিদেশী ভদ্রলোক বোধকরি সকালের ট্রেন ধরিবার জন্য ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই শুধু আসে না, যাহাকে সে একটিবার চোখের দেখা দেখিতে চায়! ক্রমশঃ বেলা যত বাড়িতে লাগিল, পরেশ তত বেশী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। বারে বারে সে ফিরিয়া তাকায়, কিন্তু হয়ত কোন ধারে কাহাকেও দেখিতে পায় না, আবার হয়ত' এমন একটা লোককে দেখে, যাহাকে সে দেখিতে চায় না। এইবার তাহার নিজের উপরেই সে যেন একটুখানি বিরক্ত হইয়া উঠিল।—মনে হইল সে বুঝি পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে এমন মূর্খের মত সে বসিয়াই বা থাকিবে কেন,—আর যাহাকে তাহার নিকট হইতে বহু দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাকেই একটিবার দেখিবার জন্য তাহার এই দুর্ব্বার আকাঙ্খাই বা কিসের? চলিয়া যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা গরুর পাল লইয়া একজন রাখাল সেই পথে আসিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে ধীর অচঞ্চল পদে কলসী কাঁখে কে একটি মেয়ে সেইদিকে আসিতেছে দেখিয়া পরেশ একবার তাহার দিকে তাকাইল। সম্মুখে গরু-বাছুরের ভিড় ঠেলিয়া মেয়েটি বোধহয় তাড়াতাড়ি হাঁটিতে পারিতেছিল না। পথের উপর ধূলা উড়িতেছিল,—ভাল চিনিতেও পারা গেল না। তথাপি চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া পরেশের কেমন যেন সন্দেহ হইল। তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। চিনিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু অচলা যে ইহারই মধ্যে এত রুগ্না, এত বিশ্রী হইয়া যাইতে পারে পরেশ যেন প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। চোখা-চোখি হইতেই অচলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মুখের উপর

দিয়া যেন হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, কিন্তু একটা কথাও সে বলিতে পারিল।

জেলখানায় সে যে কিরূপভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছে, এতদিন ধরিয়া সে যে কাহার ভাবনা ভাবিয়া নিজেকে হত্যা করিয়াছে, অচলা নিমিষেই তাহা টের পাইল। তাহার সেই সোনার মত গায়ের রং একেবারে কালী হইয়া গেছে,—সে রূপ নাই, সেই লাবণ্য নাই,—এ যেন সে পরেশই নয়! চোয়ালের হাড় দুইটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চোখ বসিয়াছে, নাকটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, ধূলি-মলিন রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়িতেছে! দুজনেই দুজনের সেই ক্ষয়-ক্ষীণ, মলিন, রুক্ষ দেহের পানে একবার তাকাইল। রাত্রি জাগরণ-ক্লিষ্ট দুজনের সেই কম্পিত ব্যাকুল চারিটি চোখের তারা, দূর হইতে কি যে বলাবলি করিল, কেহই জানিতে পারিল না। কি একটা কথা জানিবার জন্য অচলার ঠোঁট দুইটি একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই, বেদনার্ত্ত ক্ষীণকণ্ঠে পরেশ বলিয়া উঠিল, আর আসব না, চল্‌লাম। এই বলিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া প্রাণপণে সে তাহার মুখখানি ফিরাইয়া লইল এবং তাড়াতাড়ি মাঠের পথে নামিয়া পাগলের মত টলিতে টলিতে দ্রুতপদে সোজা চলিয়া গেল।

অচলার কোন কথাই বলা হইল না। তাহার মুখের কথা মুখেই আটকাইয়া রহিল। শূন্য মাঠের উপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল, অচলা সেই বাঁশতলায় দাঁড়াইয়া সেদিক হইতে কিছুতেই তাহার অপলক দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না। কিন্তু পরেশ একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। অবশেষে দূরের কয়েকটা ইট্-পাঁজা ও গাছের আড়ালে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অচলার চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতেছিল। হঠাৎ তাহার সেই

চোখের কোণ বাহিয়া দুইটি অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিল। কিন্তু কাহার জন্য? আঁচলে চোখ মুছিয়া আবার সে ঘরের দিকেই চলিতে লাগিল।

গতরাত্রে একটিবারের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই। রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি সে মুখ বুঁজিয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছে,—এক্ষণে আবার সেই বেদনাটা যেন ধীরে-ধীরে জাগিয়া উঠিল। অতিকষ্টে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কোনরকমে অচলা কাপড় না :কাচিয়াই ঘয়ে ফিরিল।

মানদা বলিয়া উঠিল, এই যে গো মা-লক্ষ্মী, এলেন একবার বেড়িয়ে-চেড়িয়ে। দাও একবাটি চা দাও, খেয়ে ঘুমুক্ গে।

অভয়া চা করিতেছিল। মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, হ্যাঁ এই যে, না দিলেই নয়!

অচলা কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে নীচের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল এবং অতি সন্তর্পণে দরজার খিল বন্ধ করিয়া দিয়া রাসবিহারীর জামার পকেটগুলা হাতড়াইতে লাগিল।

সতের

পরেশ পথ চলিতেছিল, কিন্তু অচলার কাতর চোখের সকরুণ দৃষ্টি যে তাহাকে ক্রমাগত অনুসরণ করিতেছে, ইহা যেন সে তাহার সর্ব্ব দেহ-মন দিয়া অনুভব করিল, অথচ, পিছন ফিরিলেই না-জানি কোন্ দুর্ব্বলতা হয়ত এখনই তাহাকে পাইয়া বসিবে,—হয়ত তাহার অন্তরাত্মা আবার কখন কোন ফাঁকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কায় সে একবার পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও পারিল না। মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গিয়া সে পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া নদী পার হইয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। আর বোধ-করি কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না ভাবিয়াই পিছন ফিরিল, কিন্তু দেখিতে না পাইয়াও সে বেশ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কি জানি সে কি মনে করিয়া ফিরিয়া গেল,—কত ব্যথা সে লইয়া গেল,—কত দীর্ঘশ্বাস সে ফেলিয়া গেল,—কে জানে!···আরও একবার সে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু সেই কয়েকটা বাঁশ গাছের ঝোঁপ ছাড়া দূর হইতে আর বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইল না।

কাল দিনের বেলায় সে যে সেই জেলের ভাত খাইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পর পেটে আর কিছু পড়ে নাই। পিপাসা তাহার গত রাত্রি হইতেই পাইয়াছিল, এখন বোধ হইল, গলাটা শুকাইয়া যেন কাঠ হইয়া গেছে। দূরে একটা পুকুরের মত বোধ হইতেছিল, পরেশ ধীরে-ধীরে সেই দিকে চলিতে লাগিল। কিন্তু পুকুরের পাড়ে উঠিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। জলের নাম গন্ধও সেখানে নাই, এমন কি, মাঝখানে যে কাঁচা পাঁকটুকু তখনও শুকাইতে বাকী ছিল, তাহারই মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য কয়েকটা শূকর রীতিমত লড়াই সুরু করিয়াছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া সে

একবার এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকাইল। পুকুরের ধারে বড় বড় গাছপালা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের আশে-পাশে লতা-গুল্মগুলা হামাগুড়ি দিয়া কিয়দ্দূর উঠিয়া আর যেন উঠিতে পারিতেছে না, পাষাণের মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটা লতায় ফুল ফুটিয়াছিল কিন্তু রৌদ্রের তেজে তাহারা একেবারে শুষ্ক ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়িবার অপেক্ষা করিতেছে। চাষ-আবাদের জন্য মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে, বীজও বোধ করি ছড়ানো হইয়াছিল, কিন্তু বীজের সেই কঠিন-আবরণের অভ্যন্তরে তাহাদের সবুজ কচি অঙ্কুরগুলি সম্ভাবনার বেদনা লইয়াই মরিয়া গিয়াছে,—সে আবরণ ভেদ করিয়া কেহ আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই। বৃষ্টির অভাবে তৃণ-শস্যহীন উঁচু-নীচু ধানের মাঠ-গুলা চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে···অদূরে বারুইপুর শহরটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল,—সেখানে গেলে হয়ত তাহার ক্ষুধার আহার এবং তৃষ্ণার জল সবই মিলিতে পারে, কিন্তু সেদিকে যাইতে তাহার ইচ্ছা করিল না, পুকুরের পাড় হইতে নামিয়া সেই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়াই সে আবার চলিতে লাগিল। শীর্ণ দুর্ব্বল পা দুইটা যেন আর চলিতে চায় না, উপবাস-ক্লিষ্ট কঙ্কালসার দেহ যেন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আকণ্ঠ পিপাসায় মনে হইতেছিল, বুঝি বা একফোঁটা জলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে এই জলশূন্য মাঠের মাঝখানেই মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে অনতি-দূরে আর একটা পুকুরের সন্ধান পাওয়া গেল। দল-শ্যাওলায় ঢাকা অতি সামান্য জলটুকু তখনও তাহাতে যাই যাই করিতেছিল। কোথাও কোনদিকে নামিবার ঘাট নাই। পরেশ তাড়াতাড়ি একহাঁটু কাদায় নামিয়া পড়িল এবং উপরের পানাগুলা ধীরে-ধীরে সরাইয়া দিয়া সেই অপরিষ্কার জল অঞ্জলি ভরিয়া যতটা পারিল পান করিয়া উঠিয়া আসিল। আর তাহার চলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। পায়ে কয়েকটা

কাঁটা ফুটিয়াছিল। মাথার উপর এত বড় প্রচণ্ড রৌদ্র, তথাপি কেমন যেন শীত-শীত করিতে লাগিল,—হয়ত বা জ্বরও আসিতে পারে। নদীর তীরে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের ছায়ায় পরেশ চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখে তাহার গ্রামে ফিরিবার পথ,—পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, পথ আরো অনেক রহিয়াছে, কিন্তু সে পথ যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই।…অদূরে মাঠের মাঝে কলের-গাড়ী চলিবার লোহার লাইন পাতা। একটা যাত্রী-গাড়ী এইমাত্র তাহার উপর দিয়া সশব্দে পার হইয়া গেল। পরেশ ভাবিল, ষ্টেশনে গিয়া এমনি একটা গাড়ীতে চড়িয়া বসিলে তাহাকে বহুদূরে টানিয়া লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তারপর?……

গ্রামে ফিরিবার রৌদ্রতপ্ত পথের ধুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরেশ এমনি সব অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। সহসা এই চিন্তা-ধারার মূল সূত্রে গিয়া অচলার সেই বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়িতেই তাহার মাথার ভিতর সব যেন আবার গোলমাল হইয়া গেল। মনে হইল, অচলা যেন তাহার মুখের পানে বড় সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল!

কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিল না কেন? কি যেন সে বলিতেও গিয়াছিল, ঠোঁট্ দুইটা একবার যেন নড়িয়াও উঠিয়াছিল; সে-ই বরং তাহাকে বলিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত দেয় নাই। কথাটা শুনিলেই বা তাহার এমন কি ক্ষতি হইত। অনাদি অনন্ত পথ ত তাহার সুমুখে এমনি পড়িয়া আছে, চিরকাল এমনি পড়িয়াই থাকিবে,—কিন্তু আজ যদি সে চলিয়া যায়, অচলার সে দুটি চোখের অনুচ্চারিত বাণী তাহারই অপেক্ষায় আমরণ সে তাহার বুকের তলায় হয়ত চাপিয়া রাখিবে,—সে-কথা কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না,—শেষের দিনে তাহার চিতার আগুনে বুকের সে আগুন পুড়িয়া নিভিয়া ছাই হইয়া যাইবে। আর সে নিজে যে তখন কোথায়

থাকিবে—থাকিবে কি থাকিবে না, তাহারও ঠিক নাই। তাহার একমাত্র পথের সম্বল ওই দুইটি নীরব নিষ্করুণ চাহনির জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কোথা কোন পথে, ঘাটে, মাঠে, আর পরের দুয়ারে দুয়ারে সে ছুটিয়া বেড়াইবে,—অবশেষে, একদিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে, ঘরের বাহিরে এমনি কোন মাঠের মাঝে পথের ধারে হয়ত সেও মরিয়া পড়িয়া থাকিবে; হয়ত কোন মুচি-মুর্দ্দফরাস দয়া করিয়া এমনি কোনও শুষ্ক নদীর তটে কিংবা কোনও পুষ্করিণীর পাড়ে আধপোড়া করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া যাইবে,—শৃগাল শকুনিতে টানাটানি করিয়া তাহার সে পচা-শবের সৎকার করিয়া দিবে। নরকঙ্কাল দেখিয়া ভূতের ভয়ে হয়ত বৎসরাধিকাল তাহার ত্রিসীমানায় লোক চলাচল বন্ধ হইবে। আবার হয়ত গ্রামের কাছাকাছি কোথাও এমন ঘটনা ঘটিয়া গেলে, গ্রামের লোক জট পাকাইয়া চাঁদা তুলিয়া অসৎকারের মড়া বলিয়া শ্মশান-কালীর পূজা দিয়া যাইবে, মদ খাইয়া হল্লা করিবে,—তাহার সেই অর্দ্ধ দগ্ধ মাথার খুলিতে হয়ত খানিকটা মদ ঢালিয়া দিয়া নেশার ঝোঁকে পায়ে পায়ে গড়াইয়া লইয়া গিয়া কোথায় কোন তেপান্তরের মাঠের ধারে ফেলিয়া দিয়া আসিবে।...এই ত জীবন! সম্মুখে শুষ্ক নদীর শুভ্র বালির দিকে তাকাইয়া এমনি সব নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা লইয়া ক্ষুৎপিপাসা-কাতর পরেশ সেই গাছের ছায়ার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

মেঘের ডাকে সহসা ঘুম ভাঙ্গিতেই পরেশ তাকাইয়া দেখিল, চারিদিক অন্ধকার করিয়া সমস্ত আকাশ জুড়িয়া কালো মেঘের সমারোহ ঘনাইয়া আসিয়াছে,—বোধ করি বহুদিন পরে আজ ভয়ানক বৃষ্টি নামিবে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, না এখনো বেলা আছে, কিছুই বুঝিবার জো নাই। তাহার মনে হইতেছিল, ঘুমের ঘোরে ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। আর কিছু তাহার মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাতালের মত টলিতে

টলিতে সে নদী পার হইল। গ্রামের দিকের সরু পথটা ধরিয়া আবার সে ফিরিতে লাগিল। এইবার একটু একটু করিয়া সব কথা তাহার মনে পড়িতেছিল কিন্তু আজিকার এই ভীষণ দুর্য্যোগে পা দুইটা যেন তাহার ঘরের দিকে চলিতে চায়,—এমন সময় পথপ্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলে কে যেন কষ্ট পাইবে, কে যেন তাহাকে তিরস্কার করিবে,—ইহাই তাহার মনে হইতেছিল। উত্তর-পশ্চিমের কালো মেঘগুলা যেন হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহার চোখের সুমুখে একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ডাকিল। কয়েকটা ঘূর্ণি বাতাস যেন মাঠের ধূলার ঘাগ্‌রা ঘুরাইয়া নাচিতে নাচিতে তাহার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। উত্তর-পশ্চিম কোণে বহুক্ষণ হইতে সাপের নিশ্বাসের মত সন্ সন্ করিয়া শব্দ হইতেছিল,—শব্দটা যেন ক্রমশঃ কাছে আসিতেছে। এইবার শব্দটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভয়ানক একটা ঝড়ের আশঙ্কা করিয়া পরেশ তাড়াতাড়ি হাঁটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গরীবের চালের খড়, পাখীর বাসা, আর মাঠের ধূলায় চারিদিক একাকার হইয়া গেল। শত সহস্র অশ্বারোহীর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের মত দ্রুত উন্মত্ত গর্জ্জনে প্রমত্ত ঝড় সমস্ত প্রান্তরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঝড়েব ধূলায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মাঠের বড় বড় ঢিলগুলা উড়িয়া আসিয়া পরেশের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল, নাকে-মুখে ধূলাবালি ঢুকিয়া দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। নিশ্বাস লওয়া যায় না,—কোন রকমে নাক-কান বন্ধ করিয়া সেই ধূলি-ব্যূহ ভেদ করিয়া যে দিকে হোক চোখ বুজিয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পরেশ উঠি-পড়ি করিয়া মাঠের খোয়ায় হোঁচট্ খাইতে খাইতে চলিতে লাগিল। আর বুঝি নিশ্বাস লওয়া যায় না। এইখানেই বুঝি তাহার জীবনের যবনিকা পড়িয়া যায়! তা যাক্ মরণে ক্ষতি নাই। জীবনে সে অনেক

পাইয়াছে। অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, কালা, হইয়া জন্মে নাই, বংশগত কোনো মারাত্মক রোগের অধিকারী হয় নাই, মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা না পাইলেও এই জগতের একটি প্রাণী তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সে নিজেও তাহাকে ভালবাসিতে পারিয়াছে,—আর কি চাই। এত সম্পদের অধিকারী করিয়া আজ যদি সে তাহারই দেওয়া বস্তু ফিরাইয়া লইতে চায়—সে-ই বা স্বেচ্ছায় তাহা দিতে পারিবে না কেন ? কিন্তু যাবার বেলা সে যদি একটি মুহূর্ত্তের তরেও তাহার সেই চোখের নীরব চাহনি দেখিয়া যাইতে পারিত। প্রিয়তমের একটি কর-স্পর্শ, এক ফোঁটা চোখের জল···তা যদি হইবার নয়, তবে না হোক্! হে ভগবান! এই বাংলার মাঠের মাটির কোলে মাথা রাখিয়া, ঊর্দ্ধে তোমার ওই অসীম বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকাইয়া, তোমারই রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমার এ জীবনের শেষ হইয়া যাক্! কোনও দুঃখ নাই, কোনও অতৃপ্তি নাই!—কিন্তু একটি প্রার্থনা! আমার জন্য যে অসুখী রহিল, তাহাকে সুখী করিবার ভার তোমারই উপর দিয়া গেলাম। তোমার কাজ তুমি করিও। পরেশ আর চলিবার চেষ্টা করিল না, সেইস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল। ঝড়ের ঝাপটে তাহাকে একটুখানি সরাইয়া লইয়া গেল,—আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিছু দূরে সশব্দে একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাঁশের বাকারি দিয়া তৈরী একটা গাছের বেড়া ঝড়ের বেগে উড়িয়া আসিয়া তাহার হাতের উপর আসিয়া ধাক্কা খাইয়া আবার গড়াইতে গড়াইতে কোথায় চলিয়া গেল। বাঁশের ছিলায় তাহার হাতের খানিকটা চাম্ড়া কাটিয়া গিয়া বোধ করি রক্ত ঝরিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি নামিল। জলের ঝাপটায় ধূলা-বালি সব পরিষ্কার হইয়া গেছে। পরেশ দেখিল, সন্ধ্যা-ঘন আকাশের নীচে তাহাদেরই গ্রামের কাছে দিব্য সচেতন অবস্থায় সে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহাকে লইয়া এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস···

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি ধরিয়া আসিল। ভিজা কাপড়টা নিংড়াইয়া লইয়া পরে আবার ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল। নদী হইতে যে সরু পথটা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে পরেশ কোন সময় সেই বাঁশগাছের তলায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঠিক এইখানটিতে অচলা আজ সকালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আজ আর হয়ত তাহার দেখা হইবে না। রাত্রিটা কোনরকমে তাহার নিজেরই বাড়ীতে কাটাইয়া দিয়া, সে কি বলিতে চায়, কাল সকালেই শুনিবে। তাহার পর কাহারও অনুরোধে সে আর কোনদিন এখানে ফিরিবে না।

নায়েবের চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া সে একটুখানি ধীরে-ধীরে চলিতেছিল। গ্রামে ঢুকিতেই শুনিতে পাইল, কোথায় কাহারা যেন কাঁদিতেছে। এইবার সে চাপা কণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি মনে হইল যেন রাসবিহারীর বাড়ীর ভিতর হইতেই আসিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপের পাশে পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। হিতলাল, একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া সেই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎ লণ্ঠনটা সে পরেশের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কে পরেশ? আয় ভাই—

পরেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি? কেন?

ধরা-ধরা গলায় হিতলাল কহিল, শুনিস্‌নি? অচলি আমাদের হয়ে গেল—

অ্যাঁ! অচলা? অ্যাঁ কে বল্‌লে? বলিতে বলিতে পরেশের মুখের কথা আটকাইয়া গেল—বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। কাঠের মত শক্ত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমনি ভাই, হঠাৎ!—কেউ কিছু জানি নে—বলিয়া গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া হিতলাল বলিল, বল্‌ছে সব ওর বাবার পকেট থেকে আফিং নাকি—যাক্, গোলমাল করে কাজ নেই। আর—

এই বলিয়া ঘরের দিকে চলিতে চলিতে হিতলাল পুনশ্চ বলিল, ও-সব কিছু নয় পরেশ, ঘরের মেয়েগুলো আমাদের মস্ত বজ্জাৎ,—বেচারাকে ওরা না খেতে দিয়েই মেরে' ফেললে—বলিতে বলিতে সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গামছা এনেছিস পরেশ? না, এনে দেব একটা? বলিয়া হিতলাল পিছন ফিরিল, কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এতক্ষণ সে এই কথাগুলা বলিতেছিল, সেই পরেশকেই আর দেখিতে পাইল না।

কাঁধ হইতে গামছাটা তুলিয়া লইয়া হিতলাল তাহার সজল চক্ষু দুইটা মুছিয়া সিক্তকণ্ঠে ডাকিল, পরেশ!

কোনও উত্তর না পাইয়া লণ্ঠনটা সে অন্ধকার পথের দিকে ভাল করিয়া তুলিয়া ধরিল,—কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গিয়া এদিক-ওদিক একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু পরেশ যে কোন ফাঁকে কখন কোনদিক দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেছে, কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

এদিকে তখন রাসবিহারীর ঘরের ভিতর অভয়া ও মানদা, অচলার শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এই আকস্মিক অকালমৃত্যু যে তাহাদের উভয়কেই কিরূপ নিদারুণ ভাবে ঘায়েল করিয়া দিয়াছে, এই কথাটাই তাহারা দুজনে যেন পাল্লা দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু রাসবিহারী বারে বারে ধমক্ দিয়া তাহাদের সতর্ক করিয়া বলিতেছিলেন, আঃ! অত চেঁচাস নে বাপু! শেষকালে কি পুলিশের হাঙ্গামা বাধাবি,—না মৎলব কি তোদের বল্‌ত?

মানদা ও অভয়া একেবারে চুপ করিতে পারিল না; তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনুচ্চকণ্ঠে চোখে কাপড় দিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া হাউ-হাউ করিতে লাগিল।

মিনতিকে সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না। সে তখন তাহার জানালার একটা গরাদ ধরিয়া বাইরের অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। চোখ দিয়া তাহার এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়ে নাই। কি যে তাহার হইতেছিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না,—সে নিজেও ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রামের কয়েকজন প্রৌঢ় ব্যক্তি ধরাধরি করিয়া নীচের ঘর হইতে অচলাকে বাহির করিয়া আনিয়া উঠানে নামাইল, তালপাতার একটা চাটাইয়ের উপর শোয়াইয়া প্রথমে তাহাতে বেশ করিয়া জড়াইয়া, শক্ত দড়ি দিয়া জোরে-জোরে বাঁধিতে লাগিল। মরিবার সময় অচলা তাহার হাত দুইটা মেলিয়াই মরিয়াছিল,—কিন্তু সে ছড়ানো-হাত বাঁধিলেও বারে-বারে বাহির হইয়া পড়িতেছিল; তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে একজন, অতিশয় দক্ষতার সহিত তাহার সে বিস্তৃত হাত দুইটা সজোরে উল্টাইয়া পট্ পট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া চাটাইয়ের ভিতর ঢুকাইয়া দিল। তাহার পর সেটাকে একটা ছেঁড়া দড়ির খাটের উপর চাপাইয়া চারজনে কাঁধে লইয়া শ্মশানে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। আলো দেখাইবার জন্য কয়েকজন আগে গেল,—অন্যান্য সকলে লণ্ঠন হাতে লইয়া পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

উপরের জানালা হইতে মিনতি একদৃষ্টে সমস্তই দেখিল। দেখিল অচলার সেই ছোট দুটি আলতা-পরা পা তাহার চোখের সুমুখ দিয়া খাটের দড়ির ফাঁকে ঝুলিতে ঝুলিতে দরজার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। লণ্ঠনের আলোকে শেষ পর্য্যন্ত আর বেশী-কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না, তথাপি সেই সামান্য আলো-ছায়ার অন্ধকারে সেই তাহার অলক্তক-রঞ্জিত পদদ্বয়ের দিকে মিনতির স্থিরদৃষ্টি একাগ্রভাবে নিবদ্ধ হইয়াই রহিল। তাহার পর চণ্ডীমণ্ডপের আড়ালে একে-একে সকলেই যখন চোখের বাহির হইয়া গেল, তখনও পর্য্যন্ত দৃঢ়মুষ্টিতে জানালার দুইটা শিক্ ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে অন্ধকার নিশিথিনীর দিকে

তাকাইয়া নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল সে-ই জানে।···

পাগল এককড়ি কাঁদিল না, চীৎকার করিল না, নীরবে শুধু মনে হইল যেন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রনায় অন্ধকার উঠানের ভিজে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।